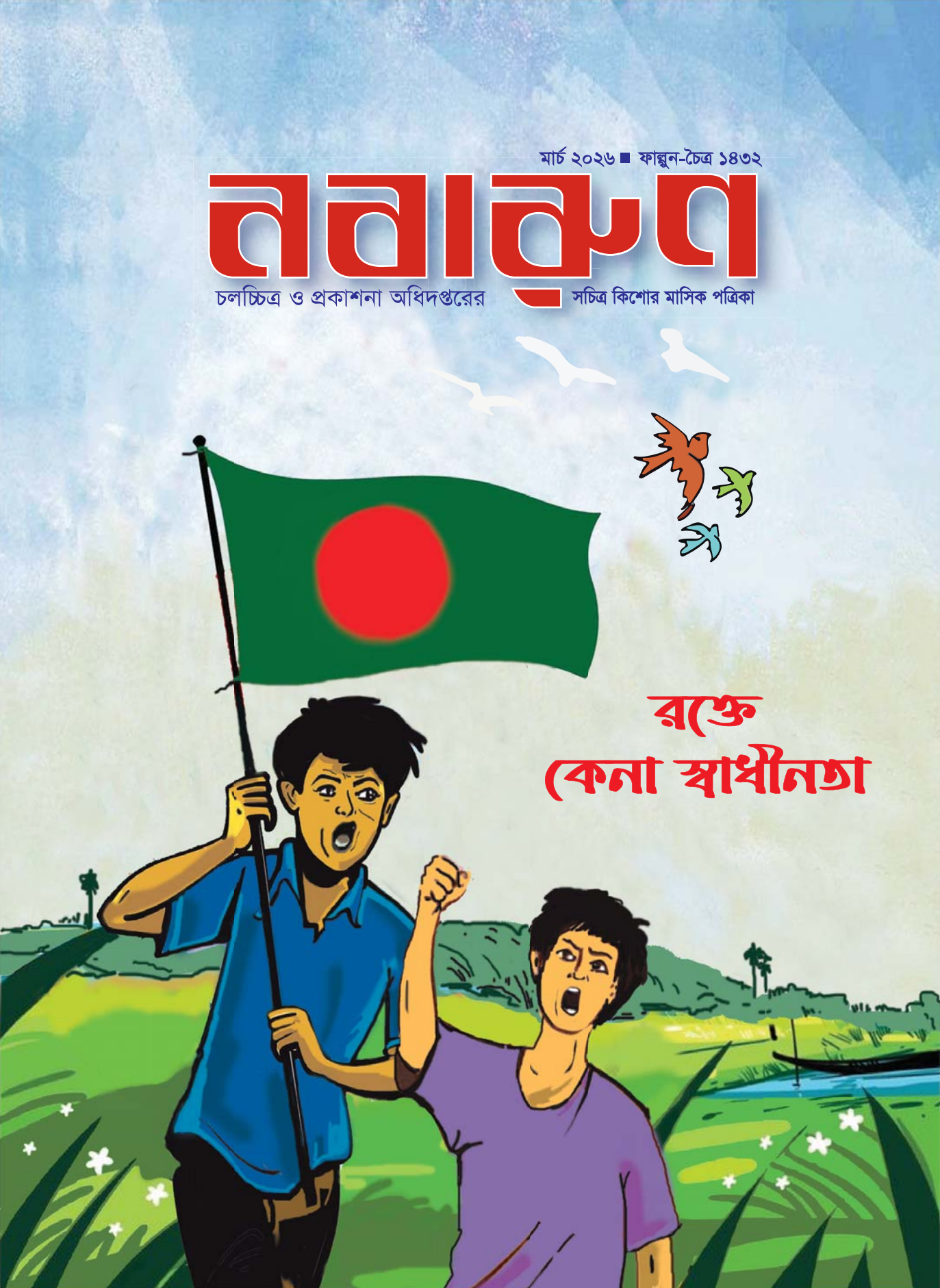
মার্চ ২০২৬ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা



রক্তে কেনা স্বাধীনতা



জ্যোতিষ্মান, প্রথম শ্রেণি, রাজধানী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রামপুরা, ঢাকা



সুলতানা আক্তার, পঞ্চম শ্রেণি, দেওয়ান পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। ২৬শে মার্চ এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক দিন। স্বাধীনতা অর্জনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক ও সর্বস্তরের জনগণসহ আত্মত্যাগকারী সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। মহান স্বাধীনতা দিবস আমাদের জীবনে সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের চেতনাকে নতুন করে উজ্জীবিত করে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করতে জাতীয় ঐক্য, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং দেশপ্রেমের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।

স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব। একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে কাজ করব।

ভালো থেকো বন্ধুরা, নবারুণের সাথেই থেকো।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
☎ ০২-৮৩০০৬৮৮
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
☎ ০২-৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

১০ স্বাধীনতার স্বাদ/ ড. ফজলুল হক তুহিন
৫০ শিশুতোষ মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫২ আন্তর্জাতিক নারী দিবস/ শাহানা আফরোজ
৫৪ বজ্রপাতে থাকি সচেতন/ রাশেদুল ইসলাম
৫৮ আন্তর্জাতিক গণিত দিবস/ মিনহাজুল ইসলাম

গল্প

০৩ পাখির মা/ এনায়েত রসুল
১৪ বাবুই নামের মেয়েটি/ আশিক মুস্তাফা
১৮ লাল-সবুজের স্বপ্ন/ সৈয়দ মো. নাজমুল ইসলাম
২১ লাল-সবুজ ছাতা/রেবা হাবিব
২৯ মুক্তিযুদ্ধের গ্রাম/ বদরুল আলম রুমান
৩৪ আজও দরজাটা বন্ধ করিনি/ আব্দুস সাত্তার সুমন
৩৭ ভালোবাসার পতাকা/ কামাল হোসাইন
৪২ মার্চ স্বাধীনতার মাস/ এম আব্দুল হালীম বাচ্চু
৪৪ ঈদের দিনে/ সাঈদুর রহমান লিটন

ছোটোদের লেখা

২৫ বাঘার মুক্তিযুদ্ধ/ মির্জা রিজওয়ান আলম
৪৬ দাদুর গোপন ডায়েরি/ মেহেরিন আনঝুম প্রিয়ন্তি

প্রতিবেদন

৬০ বিড়াল দ্বীপ/ সুমন রেজা
৬২ পানি হোক নিরাপদ/ তারান্নুম সাদিকা

কবিতাগুচ্ছ

১৩ শচীন্দ্র নাথ গাইন/ সোহরাব পাশা
১৭ বিজন বেপারী/ মো. শাহ্ আলম/ আল আমীন শেখ
২৮ মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান
৩২ বর্ণালী সান্যাল
৩৩ হাফিজ মুহাম্মদ
৪৫ আবদুল লতিফ
৪৮ মো. সৌরভ হাসান
৪৯ মো. জিয়াউল হক

ছোটোদের ছড়া

৩২ শেখ মো. জুয়েল আহমেদ
৩৩ মো. জিয়াদ হোসেন
৪১ মোছা. শামীমা ইয়াছমিন/ অর্জন পোদ্দার
ঋত্বিকা মালাকার শ্রাবন্তী
৪৫ তাহজিবা আনান
৪৮ মোছা. তিন্নি আখতার/ মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম
৪৯ মনিরা চৌধুরী মেহজাবীন/ তামান্না ইসলাম বৃষ্টি

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : জ্যোতিষ্মান/ সুলতানা আক্তার
তৃতীয় প্রচ্ছদ : হুরাইন হক কাশফিয়া
সাইফান মাসুদ আলী
শেষ প্রচ্ছদ : তাসফিয়া নাজনীন সিনথিয়া
৬৪ জায়েদ বিন রাব্বি/ সামিহা হোসেন উম্মি

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd



পাখির মা

এনায়েত রসুল

ঢাকা থেকে খুব দূরে নয় আমাদের গ্রামের বাড়ি। ইচ্ছে করলে দিনে তিনবার যাওয়া-আসা করা যায়। দিনে তিনবার না হলেও মাসে একবার বাবা গ্রামের বাড়ি যান। অথচ আমার বারো বছরের জীবনে এই প্রথম গ্রামে আসা।

গ্রামে আমার দাদা-দাদি আর ফুপু থাকেন– পাখি ফুপু। সেখানকার এক কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন। তিনি যখন ঢাকায় আসেন তখন আমার জন্য অনেক কুল আর তেঁতুল নিয়ে আসেন।

ঢাকা থেকে যাওয়ার সময় প্রতিবারই সবার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যান বাবা। এবারো নিয়েছেন। সেগুলো বের করে দিতে দিতে কার জন্য কোন জিনিসটি এনেছেন তার নাম বলে যাচ্ছেন বাবা। যেমন– চমৎকার একটা পাঞ্জাবি বাবার জন্য এনেছি। শাড়িটা মায়ের জন্য। এই স্যান্ডেলও মায়ের। থ্রি-পিচ এনেছি পাখির জন্য। রোলগোল্ডের চুড়িগুলোও পাখির। আর এই সুতির শাড়িটা পাখির মায়ের জন্য।



বাবার কথা শুনে আমি অবাক হলাম– বাবা বললেন সুতির শাড়িটা আমি পাখির মায়ের জন্য এনেছি। পাখির মা তো বাবারও মা! তাহলে বাবা আমার মা না বলে পাখির মা বললেন কেন?

আমি এসব কথা ভাবছি, সে সময় সুতির শাড়িটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন দাদি। তারপর বললেন, ওর জন্য কাপড় এনে ভালো করেছিস। ছেঁড়া কাপড় পরে ঘোরাঘুরি করে।

এবার আমার আরো অবাক হওয়ার পালা। দাদির কথা শুনে মনে হচ্ছে পাখির মা নামে অন্য কেউ আছেন। কিন্তু তিনি কে?

আমার পাখি ফুপু এক জীবন্ত অভিধানের মতো। সব প্রশ্নের জবাব জানা যায় তার কাছ থেকে। তাই পাখি ফুপুকেই জিজ্ঞেস করলাম– ফুপু! বাবা আর দাদি পাখির মায়ের কথা বলছিলেন। বাবা একটা শাড়িও এনেছেন তার জন্য। এ নামে কি অন্য কেউ আছেন?

ফুপু বললেন, তুই আর কোনোদিন তার নাম শুনিসনি?

বললাম, নাহ্। আজই প্রথম শুনলাম।

ফুপু বললেন, শুনবি কেমন করে! গ্রামের সঙ্গে তো তোর যোগাযোগ নেই। আসা-যাওয়া থাকলে তার নাম শুনতে পেতি। দেখতেও পারতি দু-একবার।

আমি বললাম, বুঝেছি, দাদি ছাড়াও পাখির মা বলে অন্য কেউ আছেন। কে তিনি? বাবা তার জন্য কাপড় এনেছেন কেন?

ফুপু বললেন, পাখির মা আমাদের খুব কাছের মানুষ। বলতে পারিস তোর বাবা তার জন্যই বেঁচে আছেন। এই যে আমার পাখি নাম– এ নামটাও রাখা হয়েছে তার অনুরোধে। বুঝতেই পারছিস, আমাদের পরিবারে তার একটা প্রভাব ছিল।

: ছিল মানে? এখন নেই?

: এখন তো একেবারেই অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। বদলে গেছেন তিনি। পুকুরপাড়ে বসে থাকেন পাথরের মতো। খুব দুখি মানুষ বেচারি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামলেন ফুপু। অথচ পাখির মায়ের সম্পর্কে আরো কিছু জানার জন্য আমার কৌতূহল হলো। আমি বললাম, ফুপু! তার সম্পর্কে জানতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। আমাকে বলবে আরো কিছু?

ফুপু বললেন, বলব। তুই শুনতে চাইলে অবশ্যই বলব। মায়ের কাছে শুনেছি, কোনো এক দূর গ্রামের মেয়ে ছিলেন পাখির মা। আমাদের নৌকার মাঝি ছিলেন জলিল চাচা। তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। খুব গরিব ঘরের বউ ছিলেন তিনি। তাই এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে স্বামীকে সাহায্য করতেন। আমাদের ধান ভেনে দিতেন। ভাইয়াকে ভীষণ আদর করতেন। মা বলেন, পাখির মায়ের জন্য ভাইয়াকে নাকি শাসনও করতে পারতেন না তিনি। ভাইয়া দুষ্টুমি করলে মা যখন বকাঝকা দিতেন, অমনি পাখির মা এসে ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতেন। প্রতিদিন গোসল করিয়ে দিতেন। কাপড় পরিয়ে স্কুলে পাঠাতেন। আমাদের আত্মীয়স্বজন না হয়েও আপনজন ছিলেন তিনি।

একদিন গাছ থেকে পড়ে পাখির বাবা মারা যান। তারপর থেকে আরো কষ্ট করে জীবন চালাতে হয় পাখির মাকে। পাখি তখন অনেক ছোটো। পাখির বাবা মারা যাওয়ার কয়েক মাস পর দেশে যুদ্ধ বাধে। ভাইয়া তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। দুর্দান্ত সাহসী আর দারুণ জেদি ছেলে। ভয়ডর বলে কিছুই নেই তার। মুক্তিযোদ্ধাদের

ইনফরমার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। কারো বাধা-নিষেধ মানছেন না।

আমাদের লিচুতলা মাঠে পাকিস্তানি মিলিটারিদের ক্যাম্প ছিল। সেখানে রান্নাবান্নার কাজ করতেন পাখির মা। ভাইয়া তার কাছ থেকে মিলিটারিদের অনেক তথ্য জেনে নিতেন। তারপর সেসব তথ্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন।

এভাবেই পাখির মায়ের দিন কেটে যাচ্ছিল। সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রম করে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে ছিলেন তিনি। তারপরই আসে এক মর্মান্তিক দিন। সেদিন মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উলটপালট হয়ে যায় পাখির মায়ের জীবন।

এটুকু বলে থামলেন ফুপু। কিন্তু আমি কৌতূহলের চরম সীমায় অবস্থান করছি। তাই জিজ্ঞেস করলাম, মর্মান্তিক দিন মানে? কী ঘটেছিল সেদিন?

ফুপু বললেন, বলছি। ভাইয়া যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেন, এ কথাটা মিলিটারিরা জেনে গিয়েছিল। আর ভাইয়া যে পাখির মায়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, সে সম্পর্কেও একটা ধারণা হয়েছিল ওদের। তাই ওরা ঠিক করেছিল আমাদের বাড়িতে রেইড করে ভাইয়াকে ধরে নিয়ে যাবে।

: আর পাখির মাকে?

: পাখির মায়ের সম্পর্কেও নিশ্চয়ই ওদের একটা পরিকল্পনা ছিল। হয়ত ভেবেছিল আগে ভাইয়াকে শেষ করে পরে পাখির মাকে ধরবে। তো যা বলছিলাম, মিলিটারি আর ওদের দালালেরা যে ভাইয়ার অ্যাকটিভিটিস সম্পর্কে জেনে গেছে, ওরাযে রাতেই ভাইয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়িতে আসবে– এ কথা জানতে পেরে মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন পাখির মা। সঙ্গে সঙ্গে মা ভাইয়াকে সরিয়ে দিয়েছিলেন দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে।

: তারপর?

: তার পরের ঘটনাটাই মর্মান্তিক। রাতে মিলিটারিরা এসেছিল। কিন্তু সারা বাড়ি তছনছ করেও ভাইয়াকে পায়নি। তাই ওদের রাগ এসে পড়েছিল পাখির মায়ের ওপর। ওরা ছুটে গিয়েছিল পাখিদের বাড়ি। পাখির মা তখন পাখিকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। মিলিটারিরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পাখির মাকে হাজারটা প্রশ্ন করেছিল। জানতে চেয়েছিল ভাইয়ার কথা। পাখির মা বলেছেন তিনি কিছু জানেন না। ভাইয়ার কাছে কখনো কোনো তথ্য পৌঁছে দেননি।

নানা হুমকি দিয়েও যখন ভাইয়ার সম্পর্কে কোনো কথা বের করতে পারেনি, মিলিটারিরা তখন এক জঘন্য পথ বেছে নিয়েছিল। হঠাৎ ঘুমিয়ে থাকা পাখিকে তুলে নিয়ে বলেছিল, সত্য কথা বল। নইলে তোর মেয়েকে মেরে ফেলব।

পাখির মা কিন্তু তবুও ভাইয়ার কথা বলেননি। শেষমেষ ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে বলেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। জানলেও বলব না। আমার মেয়েকে মেরে ফেললেও না। কারণ, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার দেশ। তারপর আমার সন্তান।

: অবিশ্বাস্য ব্যাপার তো!

বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে বললাম আমি। পাখি ফুপু বললেন, হ্যাঁ, অবিশ্বাস্যই বটে। তবে এমন ঘটনা কেউ কেউ ঘটায় বলেই ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে।

: তারপর?

: তারপর সত্যি সত্যিই ওরা পাখিকে গুলি করে। চিরদিনের জন্য সন্তানহারা হয়েছিলেন পাখির মা।

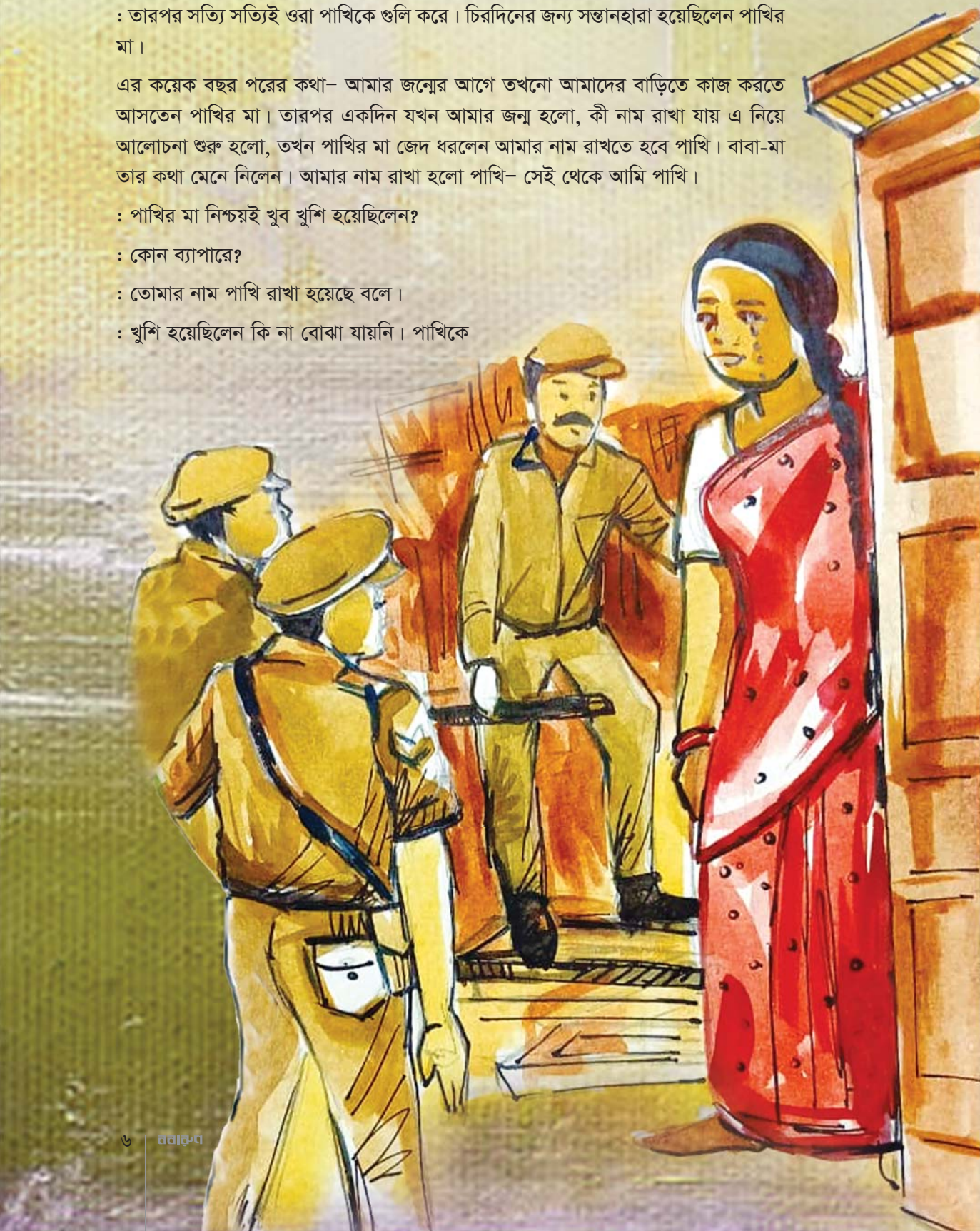
এর কয়েক বছর পরের কথা– আমার জন্মের আগে তখনো আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসতেন পাখির মা। তারপর একদিন যখন আমার জন্ম হলো, কী নাম রাখা যায় এ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো, তখন পাখির মা জেদ ধরলেন আমার নাম রাখতে হবে পাখি। বাবা-মা তার কথা মেনে নিলেন। আমার নাম রাখা হলো পাখি– সেই থেকে আমি পাখি।

: পাখির মা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছিলেন?

: কোন ব্যাপারে?

: তোমার নাম পাখি রাখা হয়েছে বলে।

: খুশি হয়েছিলেন কি না বোঝা যায়নি। পাখিকে



হারাবার পর থেকেই বদলে গিয়েছিলেন তিনি। কথা বলতেন কম। বসে বসে হাসতেন– আবার কখনো কাঁদতেন। এমন করে দিন কাটতে কাটতে একদিন পাগল হয়ে যান। এখন সারাদিন বসে থাকেন পুকুর পাড়ে। ভাইয়া মায়ের মতো শ্রদ্ধা করেন তাকে।

আমি বললাম, শ্রদ্ধা করাটাই স্বাভাবিক। আমার খুব ইচ্ছে করছে তাকে দেখতে।

ফুপু বললেন, আচ্ছা। বিকেলে তোকে নিয়ে যাবো।

দুই.

দুপুরে ফুপু ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু আমার ঘুম আসেনি। শুধু মনে পড়েছে পাখির মায়ের কথা। সামান্য এক গৃহবধূ হয়েও দেশের জন্য তার আত্মত্যাগের কথা।

এটা আমাদের গ্রামের বাড়ি। অথচ এবারই আমার প্রথম আসা। এসেই শুনতে পেলাম পাখির মায়ের মতো এক সাহসী মুক্তিযোদ্ধার কথা। এখন তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমি অধীর হয়ে প্রহর গুনছি। অথচ আরো আগে যদি গ্রামে আসা হতো, তবে আগেই পাখির মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হতো। এ কথা ভেবে নিজের ওপরই নিজের অভিমান হচ্ছে।

ফুপুর ঘুম ভাঙার পর আড়মোড়া ভাঙারও সময় পেলেন না। আমি ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম তাকে, চলো ফুপু, পাখিদের বাড়ি যাই।

ফুপু বললেন, বাড়িতে গিয়ে লাভ হবে না। খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান পাখির মা। বিকেল হলে পুকুর পাড়ে এসে বসেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। আমাদের পুকুর পাড়ে যেতে হবে।

ফুপু বলেছিলেন পুকুর পাড়ে গেলে পাখির মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে অপ্রস্তুত হতে হলো, পাখির মাকে দেখতে পেলাম না।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমাকে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করে ফুপু বললেন, রোজ বিকেলে তো এখানেই থাকেন। আজ দেখছি না কেন?

আমি বললাম, না দেখতে পাওয়ার কত কারণ থাকতে পারে। হয়ত অন্য কোথাও গেছেন। হয়ত এসেছিলেন, তবে আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরে গেছেন। এ নিয়ে না ভেবে চলো তার বাড়িতে যাই।

ফুপু বললেন, তুই শুধু বাড়িতে যাবার কথা বলছিস! কিন্তু আমি নিশ্চিত, সেখানে গেলেও তাকে পাওয়া যাবে না। সকালে বেরিয়ে রাতে ফিরে যান বাড়িতে। এ কথা এ গাঁয়ের সবাই জানে ।

: তাহলে কী করবে?

জিজ্ঞেস করলাম আমি। ফুপু কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কী আর করব। চল্, পাখিদের বাড়িতে যাই।

তিন.

পাখির মাকে তার বাড়িতে পাওয়া যাবে না আশঙ্কা করলেও বাড়িতেই পাওয়া গেল। জীর্ণ-শীর্ণ ছাপড়া ঘরে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিলেন। আমাদের দেখে উঠে বসতে চেষ্টা করেও উঠতে পারলেন না। তা দেখে ফুপু বললেন, ওঠার দরকার নেই। শুয়ে থাকুন। আজ পুকুর পাড়ে যাননি?

পাখির মা বললেন, আমি যেতে পারিনি। শরীরটা ভালো লাগছে না।

ফুপু বললেন, আমরা পুকুর পাড়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে না পেয়ে এখানে এলাম।

: তাই? কিন্তু আমাকে দেখতে তো কেউ আসে না! তুমি এলে কেন?

ফুপু বললেন, এলাম আপনাকে দেখতে। কবে থেকে অসুখ?

: পরশু থেকে। জ্বর কমছেই না।

: ওষুধ খেয়েছেন?

: ওষুধ? না মা, খাইনি। তা মা, আমার পাখিকে তুমি কোথা থেকে নিয়ে এলে? পাখি! তুই কোথায় ছিলি এতদিন?



আমার দিকে তাকিয়ে ডুকরে উঠলেন পাখির মা। সে কথা শুনে ফুপু বুঝতে পারলেন, আমাকে দেখে তার মেয়ের কথা মনে পড়েছে। এখনই ভুল ভেঙে দিতে না পারলে সমস্যা হবে।

ফুপু বললেন, এটা পাখি না। এ হলো ভাইয়ার মেয়ে। ঢাকা থেকে এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

পাখির মা অবাক হলেন ফুপুর কথা শুনে। কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে বললেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে কেন? পাগলের সঙ্গে কেউ দেখা করে?

পাখির মায়ের কথার জবাবে ফুপু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আমি বললাম, আপনি পাগল নন– আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

আমার কথা শুনে পাখির মা ম্লান হাসলেন।

আমি বললাম, এ দেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন আপনি। আমি সব শুনেছি।

: ভুল শুনেছ! ত্যাগ স্বীকার করার মতো সাধ্য ছিল আমার? সব ভুল। সব মিথ্যে। সব...

আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন পাখির মা। আমি বললাম, কারো জন্য কিছু করেছেন কিনা জানি না, তবে আমার জন্য করেছেন। আমার বাবার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি।

পাখির মা বললেন, ভুল। জীবন বাঁচানোর মালিক আল্লাহ। তিনি তোমার বাবাকে বাঁচিয়েছেন আর আমার পাখিকে নিয়ে গেছেন। এখন আর পাখির কথা মনে পড়ে না– মনে পড়ে ক্ষুধার কথা। কাল থেকে কিছু খাইনি।

ফুপু বললেন, আশ্চর্য! কিছু খাননি, আপনার জ্বর এসেছে– এসব কথা আমাদের জানাবেন তো!

: কী করে জানাবো? আমার তো পাখি নেই। থাকলে খবর পাঠাতে পারতাম। কোথায় যে গেল মেয়েটা!

পাখির মায়ের বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ফুপু তাকালেন আমার দিকে। তারপর বললেন, তুই একটু বোস। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

চার.

ফুপু চলে যাওয়ার পর অনেক চেষ্টা করে উঠে বসলেন পাখির মা। আমি তখনো দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাত ধরে আমাকে বসালেন তার পাশে। তারপর বললেন, তুই এতদিন কোথায় ছিলি রে? একবার যখন এসেছিস, আর তোকে যেতে দেবো না।

আমি বললাম, কিন্তু আমাকে তো যেতে হবে। কাল বাবা আসবেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য।

: না না। তোকে কোথাও যেতে দেবো না। আয় পাখি, আমার বুকে আয়। আয়... তোকে লুকিয়ে...

কথা শেষ করতে পারলেন না পাখির মা। তার আগেই প্রবল বেগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমাকে বুকে টেনে নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। পাখির মায়ের ঘর শূন্য করে আমি উঠোনে চলে এলাম। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, দৈনিক আমার দেশ



স্বাধীনতার স্বাদ

ড. ফজলুল হক তুহিন

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
‘কুঁড়েঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে’।

বাবুই হাসিয়া কহে, ‘সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচাঘর, খাসা।’

[স্বাধীনতার সুখ/ রজনীকান্ত সেন]

মানুষের মতো প্রাণিজগতেও স্বাধীনতার আনন্দ ও সুখ বিরাজ করে। প্রকৃতি থেকে মানুষ অনেক বিষয়ের মতো স্বাধীনতার শিক্ষাও পেয়ে থাকে। তবে মানুষ মাত্রই স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা তার জন্মগত অধিকার। জন্মের পর মানুষ স্বাধীন থাকে; কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে নানা ধরনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, পরাধীন হতে থাকে। স্বাধীনতার স্বাদ মিষ্টি হলেও পাওয়া অত সহজ নয়। তাই মানুষ বারবার স্বাধীনতার জন্য জীবন দেয়, রক্ত দেয় এবং সংগ্রাম করে। যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য যেসব বীরেরা প্রাণ দেন তাঁদেরকে আমরা শহিদ বলি। সেজন্য শহিদের সম্মান ও মর্যাদা অন্য সবার চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের মানুষ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই ও সংগ্রাম করেছে। সেই স্বাধীনতার ইতিহাস অনেক গৌরবের।

বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও রক্তাক্ত। আমরা ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে প্রথম মুক্ত হয়েছি ১৯৪৭ সালে। ব্রিটিশ অধীনতা থেকে স্বাধীনতা পেতে এদেশের মানুষ জীবন ও রক্ত দিয়েছে অকাতরে। সে সময় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'কান্ডারী' লিখেন যা একটি ঐতিহাসিক কবিতা। সেখানে ঐক্যের তাগিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদান স্মরণ করা হয়েছে শ্রদ্ধাসহ।

কান্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পূনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি, অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কান্ডারী হুশিয়ার!

সুদীর্ঘ ১৯০ বছরের গোলামি থেকে মুক্তির আনন্দ ছিল অসীম। কিন্তু আবারও আমরা পরাধীনতার শিকলে বন্দি হয়েছি পাকিস্তানের শাসনামলে। তেইশ বছর আন্দোলন, সংগ্রাম, গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে



অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে একাত্তরের স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা; সেইসাথে একটি সার্বভৌম মানচিত্র, পতাকা ও নতুন দেশ পেয়েছি।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি, ঢেউভাঙা নদী, পাহাড় ও সমুদ্রসহ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আমরা জীবন দিয়ে ভালোবাসি। ভালোবাসি বলেই শতাব্দী ব্যাপী এদেশের মানুষ লড়াই-সংগ্রাম করেছে। আরও একটি বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা শুধু দেশের স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ব্যক্তি, পরিবার সমাজের স্বাধীনতা সমানভাবে থাকলেই কেবল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতার অবশ্য সীমা আছে। আমার স্বাধীনতার কারণে যেন অন্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয় সেটাও মনে রাখতে হবে।

একটা জাতির জীবনে স্বাধীনতা বিশাল এক ঘটনা। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা আসে। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সবখানে স্বাধীনতা পাওয়া যেমন জরুরি তেমনি স্বাধীনতা ধরে রাখাও বেশ কঠিন কাজ। জীবনযাপনে ও মত প্রকাশে স্বাধীনতা আমাদের পাওয়া চাই; অন্যদিকে অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। সব মিলিয়ে মানুষের স্বভাবজাত যে স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ সেটার প্রতি রাষ্ট্রসহ সকলের সম্মান করতে হবে। আসলে যা ইচ্ছা তা করার নাম স্বাধীনতা নয় বরং বাধাহীনভাবে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারার নামই স্বাধীনতা। বাংলাদেশের মানুষের জীবনের স্বাধীনতা রক্ষায় তাই আমাদের প্রত্যেকের যত্নবান হতে হবে। অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, স্বাধীনতা ছাড়া মানুষ আসলে বাঁচে না। সেজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে নিজের ও অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে; সেইসাথে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে তা রক্ষায় একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কবির ভাষায়:

‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি’। ❑

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



রক্তে কেনা স্বাধীনতা

শচীন্দ্র নাথ গাইন

সুরের পাখিরা গান ভুলেছিল
জাগেনি সাগরে ঢেউ
খেয়া বাঁধা ছিল নদীর কিনারে
ঘাটেও ছিল না কেউ।

চাষিরা ছিল না ফসলের ক্ষেতে
মাঠঘাট পুরো খাঁ খাঁ
লোক গমগম বাজার ছিল না
চারিদিকে ফাঁকা ফাঁকা।

লেলিহান শিখা ছিল আগুনের
জ্বলেছিল ঘরবাড়ি
পথচারীহীন রাস্তায় ছিল
গোলাবারুদের গাড়ি।

অগণিত মানুষ শেষ হয়েছিল
ছিল মা'র আহাজারি
শোকাহত ছিল জনপদগুলো
কষ্টে বাতাস ভারী।

দুঃখ-ব্যথার পথ পাড়ি দিয়ে
হেসেছে বাঙালি জাতি
রক্ত মূল্যে স্বাধীনতা কেনা
ঘুচিয়ে আঁধার রাতি।

প্রিয় বাংলাদেশ

সোহরাব পাশা

তোমার স্নেহের ছায়া
অতুল অশেষ
জননী জন্মভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ,

ফুল পাখি তরুলতা
ঝরনার জল
ঝিরিঝিরি হাওয়া যেন
মায়ের আঁচল;

ভালোবাসি এই দেশ
ডাকি তাই 'মা' বলে
কোথাও যাবো না আর
মা মণিকে না বলে।



গল্প



বাবুই নামের মেয়েটি

আশিক মুস্তাফা

বাবুই দাঁড়িয়ে আছে বটতলায়। এই বাবুই কিন্তু পাখি না। ছোট্টমোট্ট একটা মেয়ে। পড়ে এখলাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে। চুল খোলা। গায়ের জামা বেশ পুরনো। তখন কজনইবা নতুন জামা পরত। তার উপরে চলছে যুদ্ধ। এখলাসপুরের মানুষ মিলিটারির আতঙ্কে রাত পার করে।

বাবুইয়ের বাবা তোতা মিয়া এখলাসপুর গ্রামের ইনফরমার।
কখনো গ্রামের সবচেয়ে বড়ো তালগাছটায় উঠে কপালে হাত ঠেকিয়ে মীরগঞ্জ বাজারের দিকে চেয়ে থাকেন। কখনো আবার হিরণপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে খবর নিয়ে আসেন। মিলিটারিরা দু-দিন আগে যে এখলাসপুরে এসেছিল সেই খবরটা তিনিই জামা উড়িয়ে গ্রামের সবাইকে দিয়েছিলেন। হিরণপুর গ্রামের মানুষদের ধরে মিলিটারিরা যখন খাল পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে; তা দূর থেকে দেখে দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামে ঢুকে পড়েন তোতা মিয়া। গায়ের জামা খুলে তা বাতাসে উড়িয়ে ধানক্ষেত-পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে দৌড়ান আর চ্যাঁচিয়ে বলেন-ওরে মিলিট্টারি আইয়ে গো, মিলিট্টারি আইয়ে!

গ্রামের বৌ-ঝিরা অমনি দৌড়ে গিয়ে নয়ন পুকুরে পড়ে। চোখের মতো স্বচ্ছ জলের পুকুরটা তখন একেবারে খাঁ-খাঁ। পানি নেই। তলার মাটি ফেটে চৌচির। অথচ এই পুকুরে চৈত্র মাসে গ্রাম ভেঙে পড়ে। কত আনন্দে সবাই মাছ ধরে। হইহল্লা করে। ছোটোরা মাছ দেখে আর লাফিয়ে হাততালি দিতে থাকে। কিন্তু এবার মাছ নেই। পানি নেই। তারাও যেন বুঝতে পেরেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা।

বড়োরা পুকুরে নেমে পাড়ের খোঁড়লে ঢুকে পড়েছে। কেউ কেউ খাল পেরিয়ে চলে গেছে আলাইয়ারপুর গ্রামে। তারা জানে, মিলিটারিরা সাঁকো বেয়ে খাল পেরুতে পারে না। তাই খালের ওপাড়েই নিরাপদ!

খালপাড়ে ঠিক যেখানে সাঁকোটা তার পাশেই বটগাছ। এই বটতলায় দাঁড়িয়ে আছে বাবুই। আর খালের দিকে ইতিউতি করে দেখছে। কোনো কথা বলছে না। এরই মধ্যে হিরণপুর গ্রামের বড়ো রাস্তা ধরে তাদের গ্রামে চলে এসেছে মিলিটারি জিপ। বটতলায় ছোট্ট বাবুইকে দেখে থপ্ করে লাফিয়ে নেমে বন্দুক তাক করে। বাবুই নড়েচড়ে না। কেবল পানির দিকে তাকায়। পানার ভেতর থেকে বুদবুদ ওঠে। অমনি সতর্ক হয়ে সেদিকে বন্দুক তাক করে মিলিটারিরা। একজন শব্দ করে বলে- 'ওঠ যা!'

কিন্তু কেউ উঠে না বরং আরো জোরে বুদবুদ উঠতে থাকে। অমনি গুলি করতে থাকে দুজন। কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠে তোতা মিয়ার নিথর দেহ। বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে বাবুই। চোখের পলক পড়ে না। মুখে কথাও আসে না। একজন মিলিটারি বন্দুকের নল দিয়ে একটা ধাক্কা দেয় ছোট্ট বাবুইকে। আরেকজন বলে, 'ইয়ে তোমহারা বাপ হে? লে যাও উসকো!'

ধুলো উড়িয়ে চলে যায় গাড়ি হিরণপুরের দিকে। কিছুক্ষণ পর গ্রামের মানুষ ছুটে আসে। বাবুইকে জিজ্ঞেস করে তোতা মিয়ার কথা। সে কথা বলে না। কেবল খালের পানার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিছুদিন পর দেশ স্বাধীন হলো। এখলাসপুর গ্রামে যেন শান্তির সুবাতাস বইতে লাগল। খালে নতুন পানি এল। নয়ন পুকুরও জলে টইটম্বুর। বড়োরা কাজে মন দিলো। ছোটোরা স্কুলে যেতে শুরু করল। বাবুইও সবার সঙ্গে স্কুলে গেল। গ্রামের সবাই সবার চেনা। কিন্তু নতুন একটা মেয়ে এল ক্লাসে। সে বাবুইয়ের পাশে বসে। কথা বলতে চায়। বাবুই কথা বলে না। নাম জিজ্ঞেস করে, তাও বলে না। বাংলা মিস ক্লাসে এসে বলেন, 'আমি হবো' কবিতাটি বলো তো। তাও বলল না।

ক্লাসে বাবুইয়ের পাশে বসা মেয়েটার নাম টুই। সে বলে, মিস ও তো কথা বলে না। কবিতাটি লিখে দিতে বলেন। মিস তাই বললেন। ওমা, চোখের পলকেই লিখে ফেলল বাবুই। কথা বলে না ঠিকই তবে সে সবই পারে! পরের ক্লাসে গণিত স্যার বোর্ডে অঙ্ক করান। স্যার শেষ করার আগেই করে ফেলে বাবুই। ইংরেজি মিস বাড়ির কাজ দেন। ক্লাসেই পরের দিনের বাড়ির কাজ শেষ করে। টুই বাবুইয়ের দিকে কেমন করে যেন তাকায়। কেন এমন করে তাকায়, তা বুঝতে পারে না বাবুই।

বাবুই একেবারে পেছনের বেঞ্চে বসেছে। ক্লাস চলছে। তার চোখ জানালায়। বাইরে দেখে। স্কুল মাঠে গরু ঘাস খায়। তা দেখে খাতায় গরুর ছবি আঁকে বাবুই। ঘাস খাওয়া গরু। গরুর পিঠে একটা শালিক। বাবুই শালিকের সঙ্গে কথা বলে, শব্দ করে, অদ্ভুতুড়ে কথা বলে। যা কেউ বুঝে না।

টুই তার কথার শব্দে হাসাহাসি করে। এই দেখে বাবুই অস্থির হয়ে যায়। নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে। এবার নিজের নাম ধরে বলে, 'বাবুই কষ্ট পাচ্ছে। বাবুইয়ের সঙ্গে এমন করো না।' কিন্তু টুই বুঝে না তার কথা। আরও জোরে হাসাহাসি করে। সেই হাসিতে ক্লাসের সবাই যোগ দেয়। সে তখন মেঝেতে বসে হাত-পা দু-দিকে ছড়িয়ে দুলতে থাকে।

বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন হেডস্যার। তিনি এই দৃশ্য দেখে ক্লাসে ঢুকলেন। সবাইকে চুপ করতে বললেন। সবাই চুপ করল। বাবুই তখনও মেঝেতে বসা। হেডস্যার তার কাছে গিয়ে 'সরি' বললেন। ক্লাসের সবাই বাবুইকে 'সরি' বলল।

বাবুই নিজের আসনে বসল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে থাকল। স্যার বললেন, 'দেখো, বাবুই তোমাদের মতোই শিশু। তবে সে কিছুটা উদাসীন। নিজের মতো থাকতে পছন্দ করে। কবে থেকে এমন হয়েছে জানো?'

সবাই একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। স্যার বলেন, 'শোনো, আমাদের গ্রামের সবচেয়ে সাহসী মানুষটার মেয়ে বাবুই। আমাদের গ্রামের মানুষদের বাঁচিয়েছে মিলিটারিদের হাত থেকে সেই মানুষটার মেয়ে বাবুই। গ্রামের একমাত্র শহিদ মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে বাবুই। যেদিন তার বাবাকে তার সামনেই গুলি করেছিল মিলিটারিরা; সেদিন থেকে বাবুই কথা বলে না। তবে তোমরা তার সঙ্গে ভালো কথা বললে, তাকে কষ্ট না দিলে, গল্প করলে, খেলায় নিলে সে ঠিকই তোমাদের বন্ধু হয়ে যাবে। আবার সে কথা বলবে।'

স্যারের কথা শেষ না হতেই হাততালির শব্দ শোনা গেল। সবাই পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে, বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বাবুই হাততালি দিচ্ছে আর বলছে, 'বাবুই মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে। বাবুইয়ের বাবা অনেক সাহসী!'

সেদিন থেকে বাবুইয়ের বন্ধুর আর অভাব রইল না। বাবুই বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যায়। স্কুল শেষে বাবার জন্য বটগাছের নিচে এসে দাঁড়ায় বন্ধুদের নিয়ে। খালের পানি থেকে বুদবুদ উঠলে তবেই সে বাড়ির পথ ধরে বুক ফুলিয়ে। তার বাবা যে এখলাসপুরের একমাত্র শহিদ মুক্তিযোদ্ধা; এই গর্বে! ❑

শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, দৈনিক সমকাল



গৌরবের মার্চ

মো. শাহ্ আলম

২৬শে মার্চ নিয়ে এল
নতুন দিনের সূচনা
বাংলা পেল নিজের সুরে
নতুন সুরের মূর্ছনা।

আজ আমরা স্বাধীন
মাথা তুলে দাঁড়াই,
তাঁদের আত্মত্যাগেই পেয়েছি
প্রিয় সোনার বাংলায় ঠাঁই।

শহিদদের এই ঋণ
শোধ হবে না কোনোদিন,
তাঁদের স্মৃতি থাকবে
বাঙালির হৃদয়ে অমলিন।

মার্চ এলেই

বিজন বেপারী

মার্চ এলেই অগ্নিঝরা
রক্তঝরা দিন
অকুতোভয় সৈনিক যাঁরা
তাঁদের কাছে ঋণ।

স্বাধীনতার বার্তা পেলাম
বেতার কেন্দ্র থেকে
কালুরঘাট আজ বইয়ের পাতায়
ছোট্ট নবীন শিখে।

ওরে নবীন এই বাঙালি
যুদ্ধে কেনা দেশ
একাত্তরের ত্রিশ লক্ষ
স্বাধীন বাংলাদেশ!

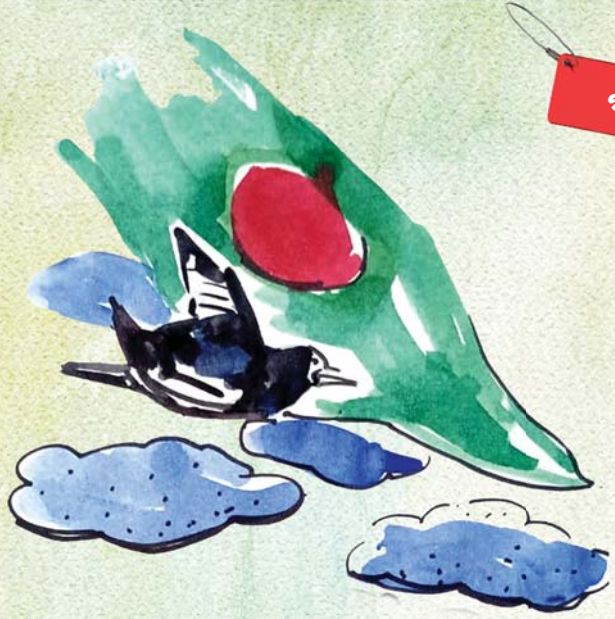
স্বাধীনতার শপথ

আল আমীন শেখ

২৫শে মার্চ রাত ছিল
নিষ্ঠুরতার হাহাকার
নিরপরাধ মানুষ হলো
অত্যাচারের শিকার।

পাক বাহিনীর গুলিতে
কেঁপে ওঠে শহর,
বাংলার প্রতিটি ঘরে
নামে শোকের প্রহর।

তবুও ভয় পায়নি
সেই তরুণের দল
জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে
দেশের সহায়সম্বল।



গল্প

লাল-সবুজের স্বপ্ন

সৈয়দ মো. নাজমুল ইসলাম

মার্চের শেষের দিক। চারপাশে এক অদ্ভুত উত্তেজনা, ভয় আর আশার মিশেল। গ্রামের নাম শালিখা। ছোট্ট এই গ্রামেই থাকে রাশেদ, বয়স মাত্র বারো। কিন্তু তার চোখে যেন বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বোঝাপড়া।

রাশেদের বাবা আবদুল করিম একজন সাধারণ কৃষক। সারাদিন মাঠে কাজ করেন, আর রাতে চুপচাপ বসে থাকেন গ্রামের চায়ের দোকানে। আগে সেখানে হাসিঠাট্টা হতো, কিন্তু এখন সবাই নীচু গলায় কথা বলে। দেশজুড়ে যে অস্থিরতা চলছে, তা গ্রামের মানুষও টের পাচ্ছে।

একদিন সন্ধ্যায় রাশেদ বাবার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল,

‘আব্বা, সবাই এত চুপচাপ কেন?’

করিম সাহেব একটু থেমে বললেন,

‘বাবা, আমাদের দেশের মানুষ স্বাধীন হতে চায়। নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। কিন্তু তা এত সহজ না।’

‘স্বাধীনতা মানে কী?’

করিম সাহেব ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন,

‘স্বাধীনতা মানে হলো-নিজের কথা নিজের মতো বলতে পারা, নিজের মাটিতে মাথা উঁচু করে বাঁচা।’

রাশেদ পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও কথাগুলো তার মনে গেঁথে গেল।



এর কিছুদিন পরেই গ্রামের পরিস্থিতি বদলে গেল। রাত হলেই দূরে কোথাও গুলির শব্দ শোনা যায়। মানুষ আতঙ্কে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। একদিন গভীর রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

করিম সাহেব দরজা খুলে দেখলেন, তার বন্ধু জলিল দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর কাঁপছে, মুখে ভয়।

'করিম, সময় নাই। আমাকে যেতে হবে। আমরা লড়াই করব।'

করিম সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন,

'আমিও যাব।'

রাশেদ ঘুম থেকে উঠে সব শুনছিল। সে দৌড়ে এসে বাবার হাত আঁকড়ে ধরল,



'আব্বা, তুমি কেন যাবে?'

করিম সাহেব ছেলেকে বুকে জড়িয়ে বললেন,

'দেশের জন্য, বাবা। তোর জন্য, তোর ভবিষ্যতের জন্য।'

পরদিন ভোরেই করিম সাহেব চলে গেলেন। যাওয়ার আগে রাশেদের হাতে একটা পুরোনো লাল-সবুজ কাপড় দিয়ে বললেন,

'এটা যত্ন করে রাখিস। এটা আমাদের স্বপ্ন।'

দিন যেতে লাগল। রাশেদ তার মায়ের সাথে বাড়িতে থাকে, কিন্তু তার মনে সবসময় বাবার কথা। মাঝে মাঝে গ্রামের মানুষজন খবর নিয়ে আসে-কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, কোথাও বিজয় আসছে।

একদিন দুপুরে রাশেদ মাঠে বসে সেই লাল-সবুজ কাপড়টা দেখছিল। হঠাৎ তার মনে হলো, এই কাপড় শুধু

একটা কাপড় না- এটা যেন তার বাবার সাহস, তার দেশের আশা।

গ্রামের কিছু বড়ো ছেলেরা তখন গোপনে কাজ করছিল- সংবাদ পৌঁছানো, আহতদের সাহায্য করা। রাশেদও তাদের সাথে যোগ দিল। সে ছোটো বলে কেউ তাকে সন্দেহ করত না। সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খবর পৌঁছে দিত।

একদিন সে খবর নিয়ে ফিরছিল, হঠাৎ রাস্তায় কিছু সশস্ত্র লোক দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে দৌড়ে পাশের ঝোপে লুকালো। তার বুক ধড়ফড় করছে, কিন্তু সে মনে মনে বাবার কথা ভাবল- 'ভয় পেলে চলবে না।'

কিছুক্ষণ পর সে নিরাপদে বাড়ি ফিরল। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'তুই এসব করিস না, বাবা। আমি তোকে হারাতে পারব না।'

রাশেদ শান্ত গলায় বলল,

'আম্মা, আব্বা তো দেশের জন্য গেছে। আমি কিছুই করব না?'

মা চুপ করে রইলেন। তার চোখে জল, কিন্তু মুখে গর্বের ছাপ।

অবশেষে এল সেই দিন। ডিসেম্বরের এক সকালে গ্রামে হঠাৎ আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। সবাই চিৎকার করে বলছে, 'আমরা স্বাধীন! আমরা জিতেছি!'

রাশেদ দৌড়ে বাইরে গেল। চারদিকে মানুষের মুখে হাসি, কেউ কাঁদছে আনন্দে, কেউ আলিঙ্গন করছে একে অপরকে।

কিন্তু তার চোখ খুঁজছে একজনকে- তার বাবাকে।

কয়েকদিন পর করিম সাহেব ফিরে এলেন। তার শরীরে ক্লান্তি, চোখে গভীরতা, কিন্তু মুখে এক তৃপ্তির হাসি। রাশেদ দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'আব্বা, আমরা কি সত্যি স্বাধীন?'

করিম সাহেব মাথা নেড়ে বললেন,

'হ্যাঁ, বাবা। অনেক ত্যাগের পর আমরা স্বাধীন হয়েছি।'

রাশেদ দৌড়ে ঘরে গিয়ে সেই লাল-সবুজ কাপড়টা নিয়ে এল।

'দেখো আব্বা, আমি এটা রেখেছি।'

করিম সাহেব কাপড়টা হাতে নিয়ে বললেন,

'এটা এখন শুধু আমাদের না, এটা পুরো দেশের।'

সেদিন বিকেলে পুরো গ্রাম একসাথে জড়ো হলো। সবাই মিলে সেই লাল-সবুজ কাপড়টা উঁচু করে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধল। বাতাসে তা উড়তে লাগল।

রাশেদ তাকিয়ে থাকল। তার মনে হলো, এই পতাকা শুধু কাপড় না- এটা তার বাবার সাহস, তার মায়ের অশ্রু, আর অগণিত মানুষের ত্যাগের প্রতীক।

সে ধীরে ধীরে বলল,

'এটাই তাহলে স্বাধীনতা'।

তার বাবা পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,

'হ্যাঁ, বাবা। এই স্বাধীনতা ধরে রাখাই এখন আমাদের দায়িত্ব।'

রাশেদ আকাশের দিকে তাকালো। তার চোখে তখন নতুন স্বপ্ন-একটা সুন্দর, স্বাধীন দেশের স্বপ্ন। ❑

সাংবাদিক, রাইজিং বিডি ডট কম



লাল-সবুজ ছাতা

রেবা হাবিব

২৬শে মার্চের সকালটা আজ অদ্ভুত রকমের চুপচাপ। এমন চুপচাপ, যেখানে মনে হয় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের গলির মাথায় লাল-সবুজ পতাকা উড়ছে। পতাকাটা এমনভাবে উড়ছে যেন সে নিজেই খুব গর্বিত। বাতাসে বুক ফুলিয়ে বলছে, ‘ দেখেছ? আমি কিন্তু সহজে আসিনি।’

আমার নাম রাশেদ। ক্লাস সেভেনে পড়ি। পড়াশোনায় মাঝারি, দুষ্টুমিতে ফার্স্ট ক্লাস। আমাদের বাসার নিচে আজ সকাল থেকেই হইচই। কারণ, স্কুলের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। আমি নিচে

নামতেই দেখি, মিঠু ব্যানার টানছে, কিন্তু ব্যানারের উলটো দিক লাগিয়ে ফেলেছে। ব্যানারে লেখা, 'শাধিনতা দিবস মুবারক!'

আমি বলি, 'এই বানানটা কি ঠিক হলো?'

মিঠু মাথা চুলকায়।

'ভাই, 'শা' আর 'সা' তো প্রায় একই রকম।

ঠিক তখনই পেছন থেকে গম্ভীর গলা, 'একই রকম না।'

আমরা সবাই চমকে যাই।

গলার মালিক মতিন চাচা। মতিন চাচা আমাদের গলির সবচেয়ে রহস্যময় মানুষ। বয়স আন্দাজ করা যায় না। কখনো মনে হয় ষাট, কখনো আবার চল্লিশ। সব সময় সাদা পাঞ্জাবি পরে থাকেন। পকেটে একটা কলম, আর চোখে এমন দৃষ্টি যেন অনেক কিছু দেখেছেন, কিন্তু বলেন না। মিঠু ভয়ে ভয়ে বলে, 'চাচা, ঠিক করে দিচ্ছি।'

মতিন চাচা ব্যানারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'শুধু বানান ঠিক করলেই স্বাধীনতা ঠিক হয়ে যায় না।'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'তাহলে কী করলে ঠিক হয়?'

মতিন চাচা আমার দিকে তাকান। একটু হাসেন। খুব ছোটো হাসি।

'শুনতে পারলে।'

'কী শুনতে পারলে?'

'নীরবতা।'

আমরা কেউ কিছু বুঝি না। মিঠু ফিসফিস করে বলে, 'চাচা আজ আবার ডিপ কথা বলছেন।'

স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

জাতীয় সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান সবই হয়। আমার দায়িত্ব ছিল নাটকে গাছের চরিত্রে অভিনয় করা। মানে, আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব। এই দায়িত্ব আমার জন্য একদম পারফেক্ট। অনুষ্ঠান শেষে মতিন চাচা আমাকে ডাকেন।

'রাশেদ, বিকেলে একটু সময় আছে?'

'আছে।'

'তাহলে আমার সাথে হাঁটতে যাবি।'

আমি অবাক হই।

মতিন চাচা সাধারণত কাউকে হাঁটার দাওয়াত দেন না।

বিকেলে আমরা হাঁটি। গলির শেষ মাথায় একটা পুরনো পুকুর আছে। পুকুরের পানিতে আকাশ দেখা যায়। লাল-সবুজ আকাশ। মতিন চাচা হঠাৎ বলেন, 'এই পুকুরটা ১৯৭১ সালে মানুষের লুকানোর জায়গা ছিল।'

আমি থমকে যাই।



‘লুকানোর?’

‘হ্যাঁ। ভয় পেলে মানুষ লুকায়। সাহস পেলে দাঁড়ায়।’

তিনি পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আমি দেখি তার চোখে পানি নেই, কিন্তু চোখটা ভিজে আছে।

‘চাচা, আপনি কি তখন ছিলেন’?

‘ছিলাম।’

তিনি ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা জিনিস বের করেন।

একটা ছেঁড়া লাল-সবুজ ছাতা।

‘এটা কার?’

‘আমার বন্ধুর।’

‘কোথায় সে?’

মতিন চাচা একটু চুপ থাকেন।

‘এই দেশেই কিন্তু দেখা হয় না।’

আমি আর প্রশ্ন করি না। বুঝে যাই, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

পরের দিন স্কুলে আমি অন্য রকম অনুভব করি। পতাকাটা তখন আর শুধু পতাকা মনে হয় না। গানটা শুধু আর গান লাগে না। আমি মিঠুকে বলি, ‘স্বাধীনতা মানে কী জানিস?’

‘ছুটি?’

‘না।’

‘ফ্রি ইন্টারনেট?’

‘না।’

আমি বলি, ‘স্বাধীনতা মানে, কাউকে ভয় না পাওয়া।’

মিঠু চুপ করে যায়।

এই চুপ করাটাও স্বাধীনতার মতো লাগে।

২৬শে মার্চের সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টি নামে। আমি ছাদে উঠি। দেখি, মতিন চাচা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে সেই ছেঁড়া লাল-সবুজ ছাতা। আমি বলি, ‘বৃষ্টি হচ্ছে, চাচা।’

তিনি ছাতাটা খোলেন।

ছাতার একটা শলাকা ভাঙা।

‘এই ছাতার নিচে একদিন তিনজন দাঁড়িয়েছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম, তবু পালাইনি।’

আমি জিজ্ঞেস করি, ‘আজ কেন বের করলেন?’

মতিন চাচা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আজ দিনটা মনে করিয়ে দেয়, ভয় পেলেও মাথা নীচু করা যাবে না।’

বৃষ্টি পড়ে। ছাতার ওপর টুপটাপ শব্দ হয়। আমার মনে হয়, এই শব্দগুলো গল্প বলছে। গল্প স্বাধীনতার।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে জানালার বাইরে তাকাই। পতাকাটা এখনো উড়ছে। আমি ফিসফিস করে বলি, ‘আমি শুনতে পাচ্ছি।’ হয়ত আমি ভুল। হয়ত ঠিক। কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চিত, স্বাধীনতা শুধু ইতিহাস বইয়ে না, স্বাধীনতা থাকে মানুষের মনে। আর কোনো কোনো ছেঁড়া ছাতায়। ❑

গল্পকার



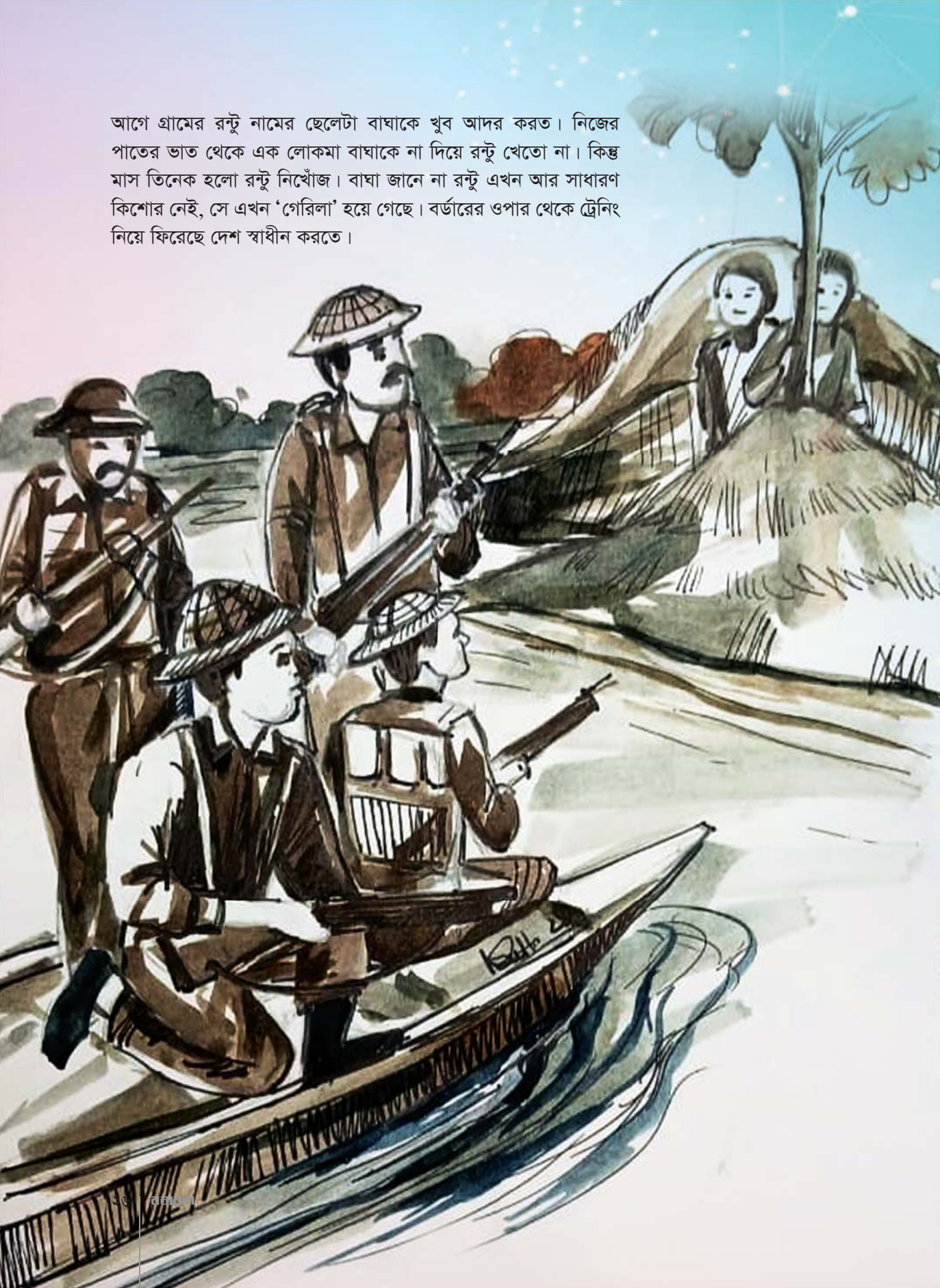
বাঘার মুক্তিযুদ্ধ

মির্জা রিজওয়ান আলম

একাত্তরের পৌষ মাস। হাড় কাঁপানো শীত আর ঘন কুয়াশায় চারদিক জবুথবু। যুদ্ধের ভয়ে হিজলতলি গ্রামটা এখন প্রায় জনমানবহীন। সন্ধ্যা নামলে কেবল ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

সেই গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ভাঙা বারান্দার নিচে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে 'বাঘা'। বাঘা কোনো মানুষ নয়, গ্রামের এক সাধারণ কুকুর। গায়ের রংটা ধুলোমাখা সোনালি, গলায় একটা সাদা দাগ।

আগে গ্রামের রন্টু নামের ছেলেটা বাঘাকে খুব আদর করত। নিজের পাতের ভাত থেকে এক লোকমা বাঘাকে না দিয়ে রন্টু খেতো না। কিন্তু মাস তিনেক হলো রন্টু নিখোঁজ। বাঘা জানে না রন্টু এখন আর সাধারণ কিশোর নেই, সে এখন 'গেরিলা' হয়ে গেছে। বর্ডারের ওপার থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছে দেশ স্বাধীন করতে।



কয়েক দিন ধরে বাঘার পেটে দানাপানি পড়েনি। খিদের জ্বালায় ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু গ্রামে মানুষ নেই, তাই উচ্ছিষ্টও নেই। তন্দ্রার মধ্যেই হঠাৎ তার নাকে একটা ভিনদেশি গন্ধ এল। উৎকট গন্ধ। বাঘা এই গন্ধ চেনে। এই গন্ধ যাদের গা থেকে আসে, তারা খুব ভয়ানক। তারা গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালায়, মানুষ মারে।

বাঘা ভয় পেলো, কিন্তু নড়ল না। স্কুলের ভাঙা পিলারের আড়ালে নিজেকে অন্ধকারের সাথে মিশিয়ে রাখল।

দূরে খালের পাড়ে পুরোনো সাঁকোটার নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে রন্টু আর তার মুক্তিযোদ্ধা দল। তাদের কাছে গোপন খবর আছে, আজ রাতে মিলিটারিরা এই খাল দিয়ে গ্রামে ঢুকবে। তাদের প্ল্যান হলো, মিলিটারিরা যখন সাঁকোর কাছাকাছি আসবে, তখন আক্রমণ করবে।

কিন্তু সমস্যা হলো সর্বনাশা কুয়াশা। এক হাত দূরের জিনিসও ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। শত্রুরা কত দূরে, বা ঠিক কোন্ পজিশনে আছে- তা বোঝা দায়। ভুল নিশানায় গুলি চালালে বিপদ আরো বাড়বে।

এদিকে বাঘার মনোযোগ এখন অন্য জায়গায়। স্কুলের পেছনের ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দ হচ্ছে। বাঘার কান খাড়া হয়ে গেল। বুটের শব্দ নয়, এটা অন্য কিছু। বাঘা দেখল, ঝোপের আড়াল থেকে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ তাকিয়ে আছে। একটা শেয়াল।

বাঘার মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রন্টু নেই তো কী হয়েছে, এই স্কুলের বারান্দা বাঘার রাজত্ব। ওই শেয়ালটা নিশ্চয়ই বাঘার লুকিয়ে রাখা পুরনো হাড়টা চুরি করতে এসেছে। এমনিতেই পেটে খিদে, তার ওপর নিজের এলাকায় অন্য প্রাণীর প্রবেশ— সহ্য হলো না তার।

ভুলে গেল মিলিটারির ভয়। বাঘা পিলারের আড়াল থেকে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এল। শেয়ালটাকে লক্ষ্য করে বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ...'

রাতের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল বাঘার গর্জনে। শেয়ালটা ভয় পেয়ে ভোঁ-দৌড় দিলো। বাঘাও নাছোড়বান্দা, সেও ছুটল পিছু পিছু।

শেয়ালটা বাঁচতে দৌড় দিলো খালের পাড় ঘেঁষে, ঠিক যেখানে অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিল একদল পাক সেনা। তাদের পরিকল্পনা ছিল, চুপিচুপি রন্টুদের ক্যাম্প ঘিরে ফেলবে।

হঠাৎ বাঘার এই তীব্র চিৎকার আর দৌড়াদৌড়িতে কমান্ডার ভড়কে গেল। এই ঘন কুয়াশায় তারা ভাবল, মুক্তিযোদ্ধারা হয়ত তাদের দেখে ফেলেছে এবং কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে বা সংকেত দিচ্ছে। কমান্ডার চিৎকার করে উঠল, 'ফায়ার। দুশমন হ্যায়।'

শুরু হলো এলোপাতাড়ি গুলি। অথচ তখনো মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দেখতেই পায়নি।

রন্টুরা এতক্ষণ শত্রুর সঠিক অবস্থান বুঝতে পারছিল না। কিন্তু মিলিটারিদের এই আগাম গুলিবর্ষণে আগুনের ঝলকানিতে রন্টুরা বুঝে গেল- শত্রু ঠিক কত দূরে এবং কোন পজিশনে আছে।

রন্টু সহযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ডান দিকে ওরা। ফায়ার।'

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা এবার সুবিধাজনক অবস্থানে। কারণ শত্রুরা নিজেদের অবস্থান আগেই ফাঁস করে দিয়েছে। আধা ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। কয়েকজন নিহত হলো, বাকিরা অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

ভোরবেলা। কুয়াশা কেটে নরম রোদ উঠেছে। বাঘা ভয়ে এতক্ষণ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। গোলাগুলির শব্দ থামতে সে ভয়ে ভয়ে বের হয়ে এল। খালের পাড়ে বারুদের গন্ধ ছাপিয়ে একটা পরিচিত গায়ের গন্ধ

পেল সে। লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেল।

রন্টু বসে আছে একটা গাছের গুঁড়িতে, কাঁধে বন্দুক। তার দল আজ বড়ো বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। হঠাৎ রন্টুর পায়ে ভেজা নাকের স্পর্শ লাগল। তাকিয়ে দেখে বাঘা। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে আর প্রবল উৎসাহে লেজ নাড়ছে।

এক সহযোদ্ধা হাসতে হাসতে রন্টুর কাঁধে হাত রাখল, 'বুঝলি রন্টু, এই কুকুরটাই আজ আমাদের বাঁচালো। ও ঠিক সময়ে ডাক না দিলে ওরা আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ত।'

রন্টু বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। বাঘা আদরে চোখ বুজে ফেলল। সে জানে না অজান্তেই সে মুক্তিযোদ্ধাদের কত বড়ো উপকার করেছে। সে শুধু জানে, তার প্রিয় বন্ধু রন্টু ফিরে এসেছে।

বাঘা আকাশের দিকে মুখ তুলে একবার তৃপ্তির ডাক দিলো। ভোরের বাতাসে তখন পতপত করে উড়ছে বিজয়ের নিশান। ❑

দ্বাদশ শ্রেণি, টেকেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, মাদারিপুর

আমার একটা দেশ আছে

মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান

আমার একটা দেশ আছে
বাংলাদেশ তার নাম..
হৃদয়ের খুব কাছে
সবুজ পাতার খাম।

মাঠের পরে মাঠ রয়েছে
ফুল-ফসলে ভরা
সবুজ পাতার খাম যেন এক
তরুলতায় গড়া।

আমার একটা আকাশ আছে
তারা ঝিলমিল
সে আকাশে জ্বলে ওঠে
আলোর মিছিল।

আমার একটা নদী আছে
জলে ভরপুর,
সে নদীতে খেলা করে
সোনালি দুপুর।

আমার একটা ভূমি আছে
মাটির আড়ং..
সে মাটিতে ছায়া ফেলে
সূর্যের রং।

আমার একটা পাখি আছে
সাদা-কালো পাখ্
ডোরাকাটা উড়ো-পাখি
দোয়েলের ঝাঁক।

আমার একটা সকাল আছে
রক্তগোলাপ
সবুজের বৃত্তে আঁকা
পতাকার ছাপ।



গল্প

মুক্তিযুদ্ধের গ্রাম

বদরুল আলম রুমান

গ্রামের নাম মনিপুর। সুরমা নদীর তীর ঘেঁষা গ্রামটিতে খুব একটা মানুষের বসবাস নেই। ছোটো দুটি টিলায় চার-পাঁচ পরিবারের বসবাস। টিলায় উৎপাদিত ফসল আর নদীতে মাছ ধরেই চলত তাদের জীবিকা নির্বাহ। গ্রামটি আকারে খুবই ছোটো, ঘন গাছপালায় ঘেরা চারপাশ। নদীর ওপার থেকে গ্রামটিতে মানুষের বসবাস তেমন বুঝা যায় না।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দু-তিন মাস পরের ঘটনা। যখন নদীর অন্য পাড়ের গ্রামগুলোতে কোনো না কোনোভাবে পাক বাহিনী আক্রমণ করছিল। তখনো মনিপুর গ্রামে কোনোরূপ আক্রমণ হয়নি। এর বেশ কিছু কারণ আছে, যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই এখানকার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর বেশিরভাগ লোকজনই জানত যে, টিলা ঘেরা এই মনিপুরে তেমন কারো বাস নেই, আর যে কয়জন থাকে ওরা নদীতে মাছ ধরা আর চাষাবাদ করেই চলে। সেই থেকে মুক্তিসেনারা গ্রামটিকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। আস্তে আস্তে ছোটোখাটো অপারেশন চলত। তাও লোকচক্ষুর আড়ালেই।

জালাল সর্দার। বয়স খুব একটা না হলেও মনিপুর গ্রামে যে কয়জন বসবাস করে তাদের চাইতে তিনিই বড়ো। তার কথা সবাই মান্য করে। সুখে-দুঃখে পাশে পায়। তার কারণেই গ্রামে মুক্তিসেনাদের আশ্রয়ের সুযোগ হয়।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জালাল সর্দার গ্রামের সবাইকে একত্রিত করে দেশের উদ্ভুত পরিস্থিতির বিস্তর বর্ণনা করলেন। পাশাপাশি সবাইকে সাবধানে চলাফেরা এবং নানা বিষয়ে কৌশল বাতলে দিলেন।

এর কিছুদিন পর জালাল সর্দারের মাথায় ভিন্ন চিন্তা এসে ভিড় করে। মনিপুর গ্রামের যে কয়জনই আছে সবাই মোটামুটি নৌকায় করে নদীতে মাছ ধরে। তাছাড়া এপার-ওপার হওয়ার কাজ তো আছেই। এখন কথা হচ্ছে, এসব নৌকার ব্যাপারে যদি পাক বাহিনী খবর পায় তাহলে নিশ্চয়ই গ্রামে আসতে চাইবে। সবকিছু ফাঁস হয়ে গেলে বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা তো আছেই। জালাল সর্দার ঠিক করলেন এখন থেকে নৌকাগুলো আর ঘাটে বাঁধা যাবে না। নোঙর করে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পাশাপাশি দিনের বেলা পারাপার কিংবা মাছ ধরা এসবও করা যাবে না। ঠিক সেরকমই চলতে থাকল।

আস্তে আস্তে গ্রামটিতে মুক্তিসেনাদের যাতায়াত বাড়তে থাকল। যুদ্ধে ব্যবহৃত নানাবিধ জিনিসপত্র এখানে এনে রাখা হতো। মুক্তিসেনাদের বাইরেও অন্যান্য গ্রাম থেকে পালিয়ে নানান লোক আশ্রয় নিতে আসে। তাও শুধু রাতের বেলা পারাপার করতে হয়।

একবার সন্ধ্যার পর পানিতে ডুবিয়ে রাখা নৌকা তোলা অবস্থায় দেখে ফেলে ওপারের মানিক বেপারী। তার মনে সন্দেহ জাগে। মনে মনে ফন্দি আঁটতে থাকে পাক বাহিনীর সহযোগী মানিক বেপারী। স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজ দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও দ্বিধাবোধ করেনি তথাকথিত এসব মানিক বেপারীরা। তাদের সহযোগিতার ফলে পাক বাহিনী বাংলার নিরীহ মানুষদের উপর যেভাবে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে, তা শুনলে গা শিউরে ওঠে।

মানিক বেপারী পরদিন তার অন্য এক সহযোগীকে পাঠায় মনিপুর গ্রামে। সব দেখে এসে যাতে খবর দিতে পারে। গ্রামে হঠাৎ একদম অপরিচিত লোক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় জালাল সর্দারের। তার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, শকুনের কালো চোখ এখানে এসে পড়েছে। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। গ্রামে অবস্থানরত সবাইকে একত্রিত করে এ নিয়ে কথা বললেন। পরামর্শ অনুযায়ী, কৌশল অবলম্বন করে মুক্তিসেনারা সেদিন থেকেই প্রতি রাতে গ্রামের পূর্ব দিকটায়, নদীর পার দিয়ে চলাচলের রাস্তার এক পাশে অবস্থান নিতে থাকেন। আর গ্রামের অন্যদের টিলার পেছনের দিকটায় থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

মানিক বেপারীর পাঠানো সোর্স গ্রাম ঘুরে এসে বিস্তর তথ্য দেয়। সব শুনে মানিক বেপারীর চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক উপচে পড়ার মতো। পাক বাহিনীর প্রধানদের সাথে এ নিয়ে কথা বলে মানিক বেপারী।

ভালো একটা সুযোগ মনে করে সেখানে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। রাতের শেষ ভাগে আক্রমণ শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। সদলবলে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে মধ্য রাত থেকেই প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে।

রাত তিনটা ছুঁইছুঁই। এত গভীর রাতে মানুষ তো দূরের কথা বেশিরভাগ পশুপাখিও জেগে থাকে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ করেই মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে চারপাশ প্রকম্পিত হতে থাকে। আগে থেকেই কৌশলী অবস্থানে থাকা মুক্তিসেনাদের বুঝতে আর বাকি নেই। নিজেদের অবস্থান জানান না দিয়েই চুপচাপ থাকে। পাক সেনারা আচ্ছামতো গুলি ছুড়তে থাকে। একটা পর্যায়ে এসে তাদের গোলাগুলি শেষ হয়। তারা ভেবে নেয় সফল হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এ ভাবনা যে নিছক কাল্পনিকতা ছাড়া কিছুই না। মনের খুশিতে যখন নদীর তীর ধরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে ঠিক তখনি বাংলার বীর সেনাদের আক্রমণ। চতুর্মুখী আক্রমণে

কোনোকিছু বুঝে উঠার আগেই পাক সেনাদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়। পূর্ব কৌশলী অবস্থার কারণেই সেদিন মুক্তিসেনাদের হাতেই পাক সেনা আর তাদের সহযোগী দোসর কতিপয় মানিক বেপারীদের প্রাণ হারাতে হয়। কম করে হলেও ২৫ থেকে ৩০ জনের উপরে মারা যায়।

রাতের গভীরতা কমে আকাশটা পরিষ্কার হতে শুরু করছে। মুক্তিসেনাদের সবাই একে একে জড়ো হলেন। সবার চোখে-মুখে স্বস্তির ছাপ। জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনে ব্যস্ত সবাই। ততক্ষণে লাল টুকটুকে সূর্যটা পূর্ব দিকে উদিত হতে লাগল। চারদিক থেকে লোকজনের উপস্থিতি বাড়তে থাকল।

চারপাশে স্বস্তির নিশ্বাস বিরাজ করছিল।

সেদিনের কৌশলী অবস্থানের কারণে বেঁচে যান মুক্তিসেনা এবং মনিপুর গ্রামের সাধারণ মানুষ। আর এভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে বাংলার স্বাধীনতার যাত্রা...। ❑

প্রবাসী লেখক, যুক্তরাজ্য



সেই কালরাত

শেখ মো. জুয়েল আহমেদ

২৫শে মার্চ সেই ভয়াল রাত
অন্ধকারে ঢাকা দেশ
পাক সেনাদের আক্রমণে
হয়ে যায় সব নিঃশেষ।

মায়ের কোলে শিশু কাঁদে
বাবার বুক হয় শূন্য
নির্দয় অত্যাচারে
ভেঙে পড়ে স্বপ্ন।

তবুও বুকের ভেতর জ্বলে
স্বাধীনতার জাগরণ
তরুণদের চোখে জ্বলে উঠে
প্রতিশোধের বিস্ফোরণ।

একাদশ শ্রেণি, শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী
সরকারি কলেজ, গাজীপুর

স্বাধীনতার নতুন স্বপ্ন

বর্ণালী সান্যাল

স্বাধীনতার নীল আকাশে রঙিন ঘুড়ি উড়ে,
ছোট্ট পাখি গান গায়, মনের খুশি ভরে।
সবুজ ঘাসে দৌড়াই আমরা হাসি মুখে প্রাণে,
ভয় নেই আর, স্বাধীন দেশে থাকি সুখের টানে।

লাল সূর্যের আলো ঝরে নতুন দিনের ডাকে,
বন্ধুরা সব হাত ধরি, চলি একসাথে পথে।
সত্য কথা বলব সবাই, রাখব দেশের মান,
স্বাধীনতা ভালোবাসি- এটাই মোদের গান।

স্বপ্নগুলো ডানা মেলে উড়ুক আকাশ পানে,
আমার দেশ, তোমার দেশ- সবার ভালোবাসায় টানে।



স্বাধীনতার সূর্য

মো. জিয়াদ হোসেন

২৬শে মার্চ এল
রক্তিম এক ভোর
বাংলার আকাশে
জাগে নতুন সুর।

স্বাধীনতার সূর্য
উঠল ধীরে ধীরে
শহিদদের আত্মত্যাগে
দেশ দাঁড়ায় নীড়ে।

রক্ত দিয়ে তারা
লিখেছে ইতিহাস
বাংলার স্বাধীনতা-ই
ছিল তাঁদের বিশ্বাস।

নবম শ্রেণি, জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর

স্বাধীনতা

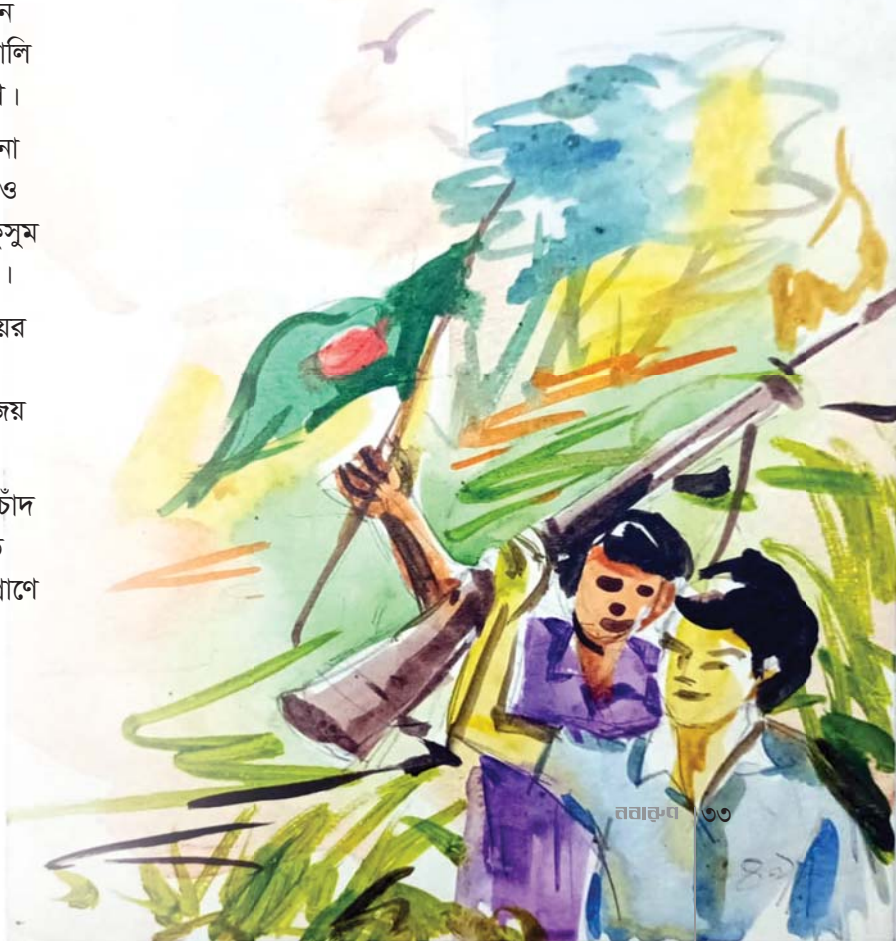
হাফিজ মুহাম্মদ

স্বাধীনতা মেলছে পাখা
লাল-সবুজের নিশান
মুক্তি পাগল বীর বাঙালি
কামার-কুমার-কৃষাণ।

স্বাধীনতা পদ্মা মেঘনা
পাল তোলা এক নাও
ভোরের রবি ফুটছে কুসুম
আমার সোনারগাঁও।

স্বাধীনতা বাংলা মায়ের
শেকল ভাঙা গান
একাত্তরের রক্তে বিজয়
মাতৃভূমির টান।

স্বাধীনতা এক ফালি চাঁদ
দেখলে নয়ন জুড়ে
খোকার মনে খুকির প্রাণে
মুক্তি পাখি ওড়ে।



গল্প

আজও দরজাটা বন্ধ করিনি

আব্দুস সাত্তার সুমন

দরজাটা আজও খোলা।

বছরের পর বছর কেটে গেছে, তবুও সেটি বন্ধ করার অভ্যাস আমার হয়নি। মা এখনও মাঝেমধ্যে বলেন, রাতে দরজাটা লাগিয়ে দিস। আমি শুধু চুপ করে থাকি। কারণ এই খোলা দরজার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমার স্বাধীনতার গল্প।



সেদিনটাও ছিল অন্য দিনের মতোই সাধারণ। বিকেলের আলোয় কোনো অশনি সংকেত ছিল না, বাতাসে ছিল না কোনো অস্থিরতা। বাবা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, দরজা বন্ধ করে রাখিস। কথাটা খুব সাধারণ ছিল কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিটা ছিল গভীর।

আমি ইচ্ছে করেই দরজাটা বন্ধ করিনি। মনে হয়েছিল, তিনি ফিরে এসে মৃদু হেসে বলবেন, কথা শুনোস নাই। সেই হাসিটা দেখার জন্যই যেন অপেক্ষা করেছিলাম।

কিন্তু তিনি আর ফেরেননি।

কয়েকদিনের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যুদ্ধের খবর, গুলির শব্দ, আগুনের লেলিহান শিখা। গ্রামের মানুষজন আতঙ্কে দিন কাটাতে লাগল। একদিন খবর এল বাবা আর নেই।

কেউ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেনি। শুধু নিঃশব্দে একটা শূন্যতা নেমে এল ঘরের ভেতর, আঙিনার ওপর, আমাদের জীবনের প্রতিটি কোণে।

তারপর একদিন এল সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

গ্রামের মাঠে লাল-সবুজ পতাকা উড়ল, মানুষের মুখে উচ্ছ্বাস, চোখে আনন্দের অশ্রু। সবাই বলল, আমরা স্বাধীন।

আমি ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিন্তু আমার চোখে সেই পতাকার রং অনরকম লাগছিল। সবুজের মাঝে যে লাল বৃত্ত, সেটি আমার কাছে সূর্য ছিল না, ছিল বাবার রক্তের এক নিঃশব্দ প্রতিচ্ছবি।

সেদিন প্রথমবার বুঝলাম স্বাধীনতা কেবল একটি রাষ্ট্রের অর্জন নয়; হারানোর বেদনাও আছে অনেক স্বজনের। কারো বাবা, কারো স্বামী, কারো সন্তান অসংখ্য অজানা মানুষের ত্যাগে গড়ে ওঠা এক মহাকাব্য।

বছর পেরিয়ে আমি বড়ো হয়েছি। মানুষ আমাকে এখন 'শহিদের সন্তান' বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই পরিচয়ের মধ্যে গর্ব আছে, সম্মান আছে কিন্তু এর আড়ালে যে শূন্যতা, তা কেউ দেখে না।

আমি যখন রাতের নীরবতায় সেই খোলা দরজার দিকে তাকাই, তখন মনে হয় স্বাধীনতা মানে শুধু একটি পতাকা নয়; স্বাধীনতা মানে সেই দরজা, যেটি আর কোনোদিন বন্ধ করা যায় না, কারণ যার জন্য অপেক্ষা, সে আর ফিরবে না।

তবুও আমি দরজাটা বন্ধ করি না।

কারণ এই খোলা দরজার মধ্যেই আমার বাবার শেষ পদচিহ্ন, শেষ দৃষ্টি, শেষ অসমাপ্ত কথাগুলো বেঁচে আছে।

স্বাধীনতা আমাকে একটি দেশ দিয়েছে কিন্তু হারিয়ে গেছে একটি মানুষ। আর সেই শূন্যতার ভেতর দিয়েই আমি প্রতিদিন স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ অনুভব করি।

হয়ত এটাই স্বাধীনতার সবচেয়ে নীরব সংজ্ঞা।

যেখানে অর্জনের আনন্দ আর হারানোর বেদনা একই সঙ্গে বেঁচে থাকে, একই পতাকার দুই রং হয়ে। ❑

প্রধান সম্পাদক, ইকরা বিডি২৪ ডট কম





ভালোবাসার পতাকা

কামাল হোসাইন

গ্রামের নাম নকিপুর। গ্রামের চারদিক ধানক্ষেত, তালগাছ, নারকেল গাছ আর বাঁশ ঝাড়ে ঠাসা। অত্যন্ত শান্ত একটা গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি খাল। বর্ষায় খালটা ফুলেফেঁপে ওঠে, আর শীতের দিনে পানি শুকিয়ে হাঁটু অবধি ঠেকে। এসময় পানিতে সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করে শুকনো শীর্ণ খালটা।

এই গ্রামেরই এক ছেলে। নাম রবি। নয় বছর বয়সের উদ্যমী একটা ছেলে। সদা চঞ্চল, হাসিখুশি আর ভীষণ কৌতূহলী। এই পৃথিবীর সবকিছুই যেন তার কাছে নতুন। সবকিছুই তার জানতে হবে।

রবির একটা বিশেষ স্বভাব আছে। তার সামনে আসা সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করা চাই!

যেমন– আকাশ কেন নীল?

ধানগাছ কেন এত সবুজ?

পাখিরা কেন সকালে এত ডাকাডাকি করে– ইত্যাদি।

প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তার মা মাঝে মাঝে হেসে বলেন, তোর মাথার ভেতরে কি মস্তবড়ো প্রশ্নের নুড়িপাথর কিলবিল করে রে রবি!

একদিনের কথা। সেদিন রবিদের স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। রবি তার বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হইচই করতে করতে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল– স্কুলের মাঠে অদ্ভুত এক ব্যস্ততা।

এলাকার কয়েকজন বড়ো ভাই মাঠের মাঝখানে বাঁশের খুঁটি পুঁতছে। কেউ রঙিন কাগজ কাটছে। কেউ আবার লাল-সবুজ কাপড় দিয়ে বড়ো পতাকা বানাচ্ছে।

রাবি অবাক হলো। আর স্বভাবমতো দাঁড়িয়ে গেল। এসময় রবির বন্ধু মিলন দৌড়ে এল। আর বলল, এই রবি! দাঁড়িয়ে গেলি যে! বাড়ি যাবি না? আয় আয়!

রবি মিলনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে কী হচ্ছে রে মিলন?

মিলন যেন একটু অবাক হলো। তারপর বলল, কেন রে, তুই জানিস না কিছু?

– কী জানব?

– আগামীকাল ২৬ শে মার্চ!

রবি একটু মাথা চুলকায়। বলল, তাতে কী হয়েছে?

মিলন মুখ টিপে একটু হাসল। বলল, আরে বোকা! ২৬ শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস!

রবির মনে এবার কৌতূহলের ঢেউ উঠল। সে সরাসরি চলে গেল তাদের শিক্ষক রাশেদ স্যারের কাছে। স্যার তখন একটা বড়ো পতাকার ভাঁজ ঠিক করছিলেন। রবি বলল, স্যার, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?

– অবশ্যই । কী জানতে চাও, বলো?

– স্বাধীনতা দিবস মানে কী?

রাশেদ স্যার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, এসো তোমাদের একটা গল্প বলি আজ।

এরই মধ্যে আরও কয়েকজন ছাত্রছাত্রী সেখানে এসে জড়ো হয়ে গেল।

স্যার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, অনেক বছর আগে যখন আমাদের এই দেশ স্বাধীন ছিল না। তখন এই দেশ অন্য একটা দেশের অধীনে ছিল। সেসময় এ দেশের মানুষের নিজেদের ভাষায় কথা বলার অধিকারও তেমন ছিল না বললেই চলে। এতে এ দেশের মানুষ তখন খুব কষ্ট পেয়েছিল। নিজের দেশে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে না, ভাবা যায়! কিন্তু তারপরও মানুষ আশা ছাড়ল না। নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার-সহ তারা চেয়েছিল নিজেদের একটা স্বাধীন দেশ। একটা স্বাধীন পতাকা।

এটুকু বলে স্যার থামলেন। মিলন জিজ্ঞেস করল, তখন কি এসকল মানুষ দেশ রক্ষায় এগিয়ে গিয়েছিল?

স্যার মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ। তখন এ দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এক হয়ে তাদের অধিকার রক্ষায় প্রায় একটা অসম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

রবি বলল, তারপর কী হয়েছিল?

স্যার যেন একটু উদাস হয়ে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে বললেন, ১৯৭১ সালে এ দেশের মানুষ নিজেদেরকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই শুরু করল। শুরু হলো এক বিশাল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের নাম মুক্তিযুদ্ধ।

ছেলেমেয়েরা চুপ করে শুনছে রাশেদ স্যারের কথা।

স্যার বললেন, দীর্ঘ নয় মাস ধরে মানুষ লড়াই করল। এতে অনেক মানুষ রক্ত দিলো। এমনকি অনেকে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিলো। তবে হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত এ দেশের মানুষ জিতে গেল। আর আমাদের এই দেশ হলো বিশ্বের মধ্যে স্বাধীন একটি দেশ।

রবি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবল। তার মনে হলো, এই গল্পটা শুধুই একটা গল্প নয়। এটা হলো একদল স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রবল সাহসী হয়ে ওঠার পুরোদস্তর গল্প।...

আর কিছু সময় পর সন্ধ্যা নেমে আসবে। বাড়ি ফেরার পথে রবি দেখল পশ্চিম আকাশে লালচে আলোর ফিনকি। পাখিরা ঝাঁকবেঁধে নিজ নিজ বাসায় ফিরছে।

রবির মনে তখন নতুন এক চিন্তা নতুন এক ভাবনার দ্যুতি খেলা করছে।

বাড়ি ফিরে সে বইয়ের ব্যাগ রেখে হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে বসে পড়ল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাগজ, কাঁচি, পেনসিল আর রং বের করল।

বাড়ি ফিরেই ওর এই ব্যস্ত হয়ে টেবিলে বসে যাওয়া দেখে রবির মা অবাক হয়ে বললেন, এই ভর সন্ধ্যায় এত আয়োজন কীসের?

রবি বলল, আমি একটা পতাকা বানাচ্ছি মা, আমাদের দেশের পতাকা। যে পতাকা আনতে গিয়ে এদেশের কত কত মানুষ জীবন দিয়েছে! তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতেই আমার এই পতাকা বানানোর চেষ্টা মা!

রবির কথা শুনে মা খুব খুশি হলেন। কিন্তু তিনি মুখে কিছু বললেন না।

মায়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে রবি তার কাজে আবার মন দিলো। খুব যত্ন করে সবুজ কাগজ কাটল। তারপর মাঝখানে গোল করে লাল সূর্য আঁকল।

মা পাশে দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ রবির কাজ কিছুক্ষণ দেখলেন।

তারপর বললেন, খুব সুন্দর হয়েছে বাবা!

মায়ের মুখে 'খুব সুন্দর হয়েছে' শুনে রবির ছোট্ট বুকটা যেন গর্বে ভরে উঠল। বলল, মা এটা আমি আগামীকাল স্কুলে নিয়ে যাব।

পরদিন খুব ভোরে রবি ঘুম থেকে জেগে উঠল। বাইরের মৃদুমন্দ বাতাসে তখন হালকা কুয়াশারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে মসজিদ থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছে।

তার কিছু সময় পর কিছুটা ফরসা হয়ে এলে রবি দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে স্কুলের দিকে হাঁটা দিলো।

স্কুলের মাঠে পৌঁছে সে অবাক হয়ে গেল। রবি পৌঁছার আগেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অনেক মানুষ হাজির হয়েছে। গ্রামের দাদা-দাদি, মা-বাবা, শিক্ষকেরা, আরো রয়েছে রবির চেয়ে কম বয়সি অনেক অনেক শিশু।

মাঠের মাঝখানে উঁচু বাঁশের নিচের দিকে বাঁধা হয়েছে বড়ো একটা লাল-সবুজ পতাকা। বাতাসে পতপত

করে দোল খেয়ে এখনই যেন সে উড়ে যেতে চায়!

রাশেদ স্যার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পতাকার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতে বললেন।

চারদিকে নিস্তব্ধতা। সবাই দাঁড়ালো। তারপর রাশেদ স্যার-সহ অন্য স্যারেরা রশি ধরে টেনে টেনে ধীরে ধীরে পতাকাটা ওপরে ওঠাতে লাগলেন। ওপরে উঠতেই বাতাসের গতি পেল। আর তাতেই দুলতে লাগল লাল-সবুজ বিশাল পতাকাটা।

রবি নিজের কাছে থাকা অতি ছোট্ট পতাকাটা শক্ত করে ধরে রাখল বুকের সাথে। তখন ওর মনে হলো, এই পতাকার ভেতরে যেন হাজারও গল্প লুকিয়ে রয়েছে। যে গল্প সাহসের। যে গল্প ত্যাগের। যে গল্প মুক্তিকামী মানুষের। যে গল্প ভালোবাসায় ঠাসা।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শেষে সবাই গলা মিলিয়ে দেশের গান গাইল।

তারপর রাশেদ স্যার সবার উদ্দেশ্যে বললেন– এই স্বাধীনতা শুধু একটা দিনের জন্য নয়। এটা প্রতিদিনের। স্বাধীনতা মানে দেশকে জীবন দিয়ে ভালোবাসা। সমাজে সৎ মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠা। আর পরস্পরকে বিপদ-আপদে সাহায্য করা।



রবি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে নিজেকে নিজে বলল, আমি দেশকে ভালোবাসব। বড়ো হয়ে দেশের জন্য কাজ করব।

পাশেই ছিল মিলন। সেও বলল, আমিও কাজ করব দেশের জন্য।

মাথার ওপরে বাতাসে দুলতে থাকা লাল-সবুজ পতাকার দিকে তাকিয়ে রবির মনে হলো, এই পতাকা শুধু এক খণ্ড কাপড় নয়। এটা একটা স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে সুন্দর করে রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার।

নকিপুর গ্রামের রোদ ঝলমল আকাশে তখন চিকচিক করে নতুন দিনের একটা সূর্য উঠেছে। ❑

প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

ভয়াল রাত

মোছা. শামীমা ইয়াছমিন

একাত্তরের ২৫শে মার্চ
সেই ভয়াল কালরাত
মানবতার ইতিহাসে
এক নির্মম আঘাত।

পাক বাহিনীর গুলিতে
কেঁপে ওঠে প্রাণ
বাংলার প্রতিটি ঘর
হয়ে ওঠে শ্মশান।

নিরপরাধ মানুষের রক্তে
ভিজে ছিল রাজপথ
বাংলার দামাল ছেলেরা
নিয়েছিল মুক্তির শপথ।

সপ্তম শ্রেণি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

স্বাধীনতার গান

অর্জন পোদ্দার

সন্ধ্যে হতে আধাঁর নামে
সেই ভয়াল রাতে,
শহিদ হয় কত লোক
হানাদারের হাতে।

যুদ্ধে নামে বীর বাঙালি
চিতিয়ে দিয়ে বুক,
লড়াই করে দেখবে তারা
স্বাধীনতার মুখ।

নয় মাস যুদ্ধ করে
দিয়ে গেল প্রাণ,
রক্ত দিয়ে লিখে গেল
স্বাধীনতার গান।

দ্বাদশ শ্রেণি, নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী

গর্বের স্বাধীনতা

ঋত্বিকা মালাকার শ্রাবন্তী

২৬শে মার্চ আমাদের গর্বের দিন
মনে জাগে স্বাধীনতার স্বপ্ন রঙিন
শহিদদের ত্যাগে পেয়েছি এই দেশ
তাদের স্মৃতি নিয়ে হৃদয়ে বাংলাদেশ।

২৫শে মার্চ রাত ছিল অশ্রু ভরা
বাংলার মানুষ তখন ছিল পথহারা
নিরীহ প্রাণ ঝরে ঘাতকের বুলেটে
বাংলার মাটি কাঁদে নিঃশব্দে।

তবুও বাঙালির মনে ছিল না ভয়
স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল অক্ষয়
তরুণেরা সাহস নিয়ে দাঁড়ায়
জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে যায়।

নবম শ্রেণি. ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা



গল্প

মার্চ স্বাধীনতার মাস

এম আব্দুল হালীম বাচ্চু

মার্চ এলেই আকাশের রং যেন একটু বদলে যায়। বাতাসে ভেসে আসে এক অদৃশ্য ডাক— স্বাধীনতার ডাক। জয়গোবিন্দপুর গ্রামের স্কুলপড়ুয়া খোকন এই ডাকটা খুব স্পষ্ট শুনতে পায়। কারণ তার দাদু ছিলেন ১৯৭১ সালের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

স্কুলে মার্চ মাস শুরু হতেই একদিন ক্লাসে শিক্ষক বললেন, 'এই মাস আমাদের গর্বের মাস। ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আত্মমর্যাদা।' খোকনের বুকটা কেঁপে উঠল। বাড়ি ফিরে সে তার দাদু বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বারের পাশে গিয়ে বসল। বয়স যতই হোক, দাদুর কণ্ঠে এখনো বেশ জোর আছে।

খোকন চোখ বড়ো বড়ো করে শুনছিল। দাদু থামলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, '২৫শে মার্চের কালরাতে হানাদার বাহিনী যখন নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন পুরো দেশ অন্ধকারে ডুবে গেল! কিন্তু সেই অন্ধকার ভেদ করেই ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা এল। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।' গ্রামের পথঘাট, খাল-বিল, মাঠ সব জায়গায় তখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলছিল। দাদু বললেন, 'আমরা ভয় পাইনি। কারণ আমাদের সামনে ছিল একটাই স্বপ্ন, আমরা পাবো একটা স্বাধীন দেশ, যেখানে আমরা নিজের ভাষায় কথা বলব, নিজেদের পতাকা উড়াব।'

খোকন জানালার বাইরে তাকাল এবং মাঠের ওপারে সে দেখল লাল সূর্যের মতো লাল-সবুজের পতাকাটা উড়ছে সারা বাংলাদেশে। সে ভাবল, এই পতাকার জন্য কত ত্যাগ! কত অশ্রু! কত রক্ত! কত কান্না!





পরদিন ২৬শে মার্চ। স্কুলে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান। খোকন সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিলো। সে বলল, 'মার্চ মানে শুধু একটি মাস নয়। মার্চ মানে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর প্রতিজ্ঞা। মার্চ মানে মাথা নত না করা।' তার কণ্ঠে ছিল আবেগের কম্পন। সহপাঠীরা চুপচাপ শুনছিল।

স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে খোকন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে দেশকে ভালোবাসবে, সততার সঙ্গে বড়ো হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কারণ স্বাধীনতা শুধু ইতিহাসের গল্প নয়; এটি দায়িত্বও।

সন্ধ্যায় দাদু তাকে বুকে টেনে বললেন, 'স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে দেশকে ভালোবাসতে হবে।' খোকন বুঝল, মার্চের শিক্ষা এখানেই, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা ধরে রাখা আরও কঠিন কাজ।

রাতের আকাশে সেদিন তারা জ্বলছিল। খোকন মনে মনে কল্পনা করল, প্রতিটি তারা যেন একেকজন শহিদের আত্মা, যাঁরা আকাশ থেকে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তাঁরা যেন বলছে, 'আমাদের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখো।'

মার্চ তাই খোকনের কাছে কেবল ক্যালেন্ডারের একটি মাস নয়। এটি সাহসের প্রতীক, আত্মমর্যাদার মাস। মার্চ মানেই স্বাধীনতার মাস। যে মাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা একটি রক্তস্নাত ইতিহাসের সন্তান, আর সেই ইতিহাসকে সম্মান জানানোই আমাদের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব। ❑

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দোগাছী কলেজ, পাবনা

গল্প

ঈদের দিনে

সাঈদুর রহমান লিটন

তরু ঈদের দিন সকাল বেলা গোসল করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। এবার ছোটো মামা ঈদ উপলক্ষে লাল পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা কিনে দিয়েছে। দেখতে দারুণ হয়েছে। মাথায় নীল রঙের টুপি, হাতে সেলাই করা, এককথায় অসাধারণ লাগছে তরুকে। লাল পাঞ্জাবি তরুর খুব প্রিয়। আর প্রিয় মামা দিয়েছে। তাই পরার লোভ সামলাতে পারেনি। সকাল সকাল গোসল করে আগে ভাগেই পরে নিয়েছে। আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে দেখো তো আমাকে কেমন লাগছে। সবাই বলছে, মাশআল্লাহ অনেক সুন্দর লাগছে। সে খুশি মনে সবাইকে সালাম করা শুরু করে। এই কাজটি তরু খুব আন্তরিকতার সাথে করে। ঈদের দিন সালাম করলে সবাই সালামি দেয়।

সালামি পেতে তরুর খুব ভালো লাগে। ঈদের দিনে তরু কয়েকশ টাকা সালামি পায়। তাই তো ঈদের দিনটা তরুর এত প্রিয়। তরু ভাবে বছরের প্রত্যেকদিনই যদি ঈদ হতো তাহলে কতই না মজা হতো। তরু মা থেকে শুরু করে বাবা, বড়ো ভাই, কাকু, ছোটো আম্মু, কাকাত ভাই সবাইকে সালাম করে। সবাই তাকে সালামি দিয়ে আদর করে দেয়। সালামি পর্ব শেষ হলে সকাল বেলা মায়ের হাতের ঈদের দিনের খিচুড়ি আর সেমাই না খেলে ভালোই লাগে না। তরু মজা করে খায়। তারপর জায়নামাজ হাতে ঈদের নামাজ পড়তে বের হয়



বাবার হাত ধরে। বাড়ি থেকে বের হয়ে বাবার সাথে দাদা-দাদি কবর জিয়ারত করে ঈদগাহে যায়। ঈদেগাহে প্রচুর লোক। সবার গায়ে আতর গোলাপের সুবাস, তরুকে বিমোহিত করে তোলে। বাবার সাথে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় করে। কিছুক্ষণ ইমামের খুৎবা শোনে। ঈদগাহের পাশে অনেক দোকান বসেছে, বিভিন্ন মিঠাই, মিষ্টির দোকান, খেলনার দোকান এসব দেখে তরুর শিশু মন লাফিয়ে ওঠে। যা যা মন চায় তরু কিনতে থাকে। আবার কিছু খাবার জিনিস কিনে খেতে থাকে। এদিকে মোনাজাত শেষে সবাই কোলাকুলি করছে। তরুর বাবা তরুর সাথে কোলাকুলি করে। তরুর ভাইও কোলাকুলি করে। তরু খুব খুশি হয়। এরপর প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি যায় ঈদগাহ থেকে ফেরার পথে। সব বাড়ি থেকে সেমাই, ফিরনি খায়। তারপর বাড়ি ফেরে। তরুর মনে খুশির জোয়ার। আনন্দে লাফাতে থাকে। ঈদের দিনটি তাড়াতাড়ি কেটে যেতে থাকে। তরু ভাবে ঈদের দিনটি যদি আরো বড়ো হতো কতই না ভালো হতো। ❑

শিক্ষক ও গল্পকার

ঈদ এসেছে

আবদুল লতিফ

ময়না, টিয়া, দোয়েল
ঘুঘু, শালিক, কোয়েল
আছে যত পাখি
বলল খুকি ডাকি
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
তোমরা জানো তা-কি?

খুশি হয়ে সকল পাখি
কিচিরমিচির ডাকি ডাকি
পাতায় পাতায় ডালে ডালে
আকাশ পানে উড়ে
ঈদের খবর ছড়িয়ে দিলো
সারা জগৎ জুড়ে।

বাগান জুড়ে ফুল ফোটে
ঈদের খুশি ঠোঁটে ঠোঁটে
গন্ধ ছড়ায় হেসে
ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে
সব মানুষের ঘরে
হাওয়ায় ভেসে ভেসে।

ঈদের চাঁদ

তাহজিবা আনান

আকাশ জুড়ে চাঁদ উঠেছে
ঈদের খুশি মন ছুঁয়েছে
ছোট্ট শিশুর হাসির রোল
আনন্দেতে মাতল দল।

দাদু দিলেন নতুন টাকা
চোখে-মুখে সুখ আঁকা
বাবা বলেন সবাই মিলে
থাকব সুখে হৃদয় খুলে।

ঈদের দিনে রাগ না করি
মিষ্টি কথাই সবার ধরি
হাসি গানে কাটুক দিন
খুশি থাকুক রাতদিন।

অষ্টম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প



দাদুর গোপন ডায়েরি

মেহেরিন আনঝুম প্রিয়ন্তি

বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালার দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশটা কেমন মেঘলা হয়ে আছে। মেহু তার দাদির ঘরে বসে আছে। সে তার দাদিকে আদর করে দাদু বলে ডাকে। মেহুর মা রান্নাঘরে ছোলা, পিঁয়াজু, বেগুনি ভাজছে, মুড়ি মাখা করবে বলে। মেহু তার দাদুর ঘরে বসে নবারুণের গল্পের বই পড়ছে। নবারুণের গল্পের বই তার বেশ পছন্দ। দাদুর ঘরটা এক অন্যরকম জগৎ, পুরনো বই আর বিচিত্র জিনিসে ভরা।

মেহু দেখল দাদু আলমারির ওপরের তাক থেকে ধুলোবালি মাখা লাল ডায়েরিটা নামালেন। ততক্ষণে মেহুর মা এসে হাজির, ছোলা মাখা নিয়ে এল ওদের জন্য। মেহুর ছোলা, পিঁয়াজু, বেগুনি খুব পছন্দের। মেহু ও দাদু খেতে খেতে গল্প শুরু করল।

মেহু কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল, দাদু এই ডায়েরিতে কী আছে? দাদু চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে মুচকি হেসে বললেন, এটা শুধু একটা ডায়েরি নয় রে মেহু, এটা ছিল আমাদের একাত্তরের সাহসের হাতিয়ার!

দাদু ধীর পায়ে মেহুর কাছে এলেন এবং ডায়েরির একটি সাদা পাতা বের করলেন। মেহু অবাক হয়ে বলল, ওকি দাদু! পাতাগুলো তো একদম সাদা, ফাঁকা!

দাদু তখন ড্রয়ার থেকে একটি মোমবাতি ও দেশলাই বের করে নিয়ে জ্বালালেন। টেবিলের ওপর মোমবাতিটি রাখলেন এবং ডায়েরির পাতাটি আগুনের একটু ওপরে ধরলেন। অলৌকিকভাবে সেখানে সাদা পাতায় খয়েরি রঙের একটি ম্যাপ আর কিছু সংকেত ভেসে উঠতে শুরু করল। মেহু বড়ো বড়ো চোখ করে বলল, দাদু, এটা কীভাবে সম্ভব? তুমি কি ম্যাজিশিয়ান?

দাদু হা হা করে হেসে বললেন, দাদুমণি, শোনো, বলছি সব। দাদু মেহুকে পুরোটা বুঝিয়ে বললেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় লেবুর রস দিয়ে আমরা এভাবেই গোপন তথ্য লিখতাম, যাতে শত্রুরা বুঝতে না পারে। আমি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে নজর রাখতাম পাকি সেনারা কখন কোথায় যাচ্ছে। তারপর সবার চোখের আড়ালে এই ডায়েরিতে ম্যাপ এঁকে রাখতাম, বিভিন্ন তথ্য দিতাম মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের।

মেহু এবার একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করল, কিন্তু দাদু, একবার তাপ দিলে তো লেখাগুলো স্থায়ী হয়ে যায়। তাহলে তো ধরা পড়ার ভয় ছিল! দাদু মেহুর পিঠ চাপড়ে বললেন, একদম ঠিক ধরেছিস! মুক্তিযোদ্ধারা পড়ার পরেই কাগজটা পুড়িয়ে ফেলতেন যাতে কোনো প্রমাণ না থাকে। দাদুর চোখে পানি টলমল করে উঠল। তিনি বললেন, কিন্তু এই শেষ ম্যাপটা আমি এঁকেছিলাম আমার ছোটো ভাই মেহেদীর জন্য। ও মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ম্যাপটা পৌঁছানোর আগেই মেহেদী শহিদ হয়ে যায়। ওর স্মৃতি হিসেবে ম্যাপটা নিজের কাছে পরম যত্নে রেখে দিয়েছিলাম, কোনোদিনও তাপ দেইনি।

আজ স্বাধীনতার এত বছর পর তোকে আমাদের বীরত্বের সত্য গল্প শোনাব বলেই এই কাগজে প্রথমবার আগুন ছোঁয়ালাম। গল্প শেষে মেহুর দাদু তার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। মেহু দাদুকে জড়িয়ে ধরে তার নরম হাতে দাদির চোখ মুছে দিল। দাদি মেহুর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, এই দেশটা আমাদের অনেক ত্যাগ আর কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত। এই দেশটাকে ভালো রাখার দায়িত্ব তোমাদের।

মেহু ডায়েরিটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে মনে মনে ঠিক করল সেও দাদুর মতো সাহসী হবে এবং দেশের মায়া বুকে লালন করবে। ❑

দ্বাদশ শ্রেণি, জয়নাল হাজারী কলেজ, ফেনী



আমার বাংলাদেশ

মো. সৌরভ হাসান

মুক্তিযোদ্ধা বীরের দল
রক্ষা করেছে দেশের বল
তাদের ত্যাগ ভুলব না
দেশকে কভু ছাড়ব না

বাংলাদেশ সবার ঘর
দেশ আমাদের অন্তর
স্বাধীনতার এই যে জয়
চিরদিন থাকুক অক্ষয়।

সোনার বাংলা আমার দেশ
ভালোবাসার নেই শেষ
দেশের জন্য প্রয়োজনে
জীবন দিব প্রতি ক্ষণে।



বাংলার গর্ব

মোছা. তিন্নি আখতার

বাংলাদেশ আমার গর্ব
আমার অহংকার,
স্বাধীনতা এনে দিয়েছে
আমাদের অধিকার।

এই স্বাধীনতাকে আমরা
ধারণ করব বুকে
দেশপ্রেম জাগুক
প্রতিটি সুখে-দুঃখে।

বাংলাদেশ থাকবে
বিশ্বের মানচিত্রে যতদিন
স্বাধীনতা আমাদের হৃদয়ে
থাকবে চির অমলিন।

অষ্টম শ্রেণি, জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
সুনামগঞ্জ

মুক্তির বার্তা

মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম

লাল-সবুজের প্রিয় পতাকা
দেখলে ভরে গর্বে বুকটা
বীর শহিদরা এগিয়ে গেল
দেশের জন্য জীবন দিলো।

পতাকা উড়ে নীলাকাশে,
মনটা ভরে আনন্দ হাসে।
স্বাধীন দেশে বাস করি
মনের সুখে গানও ধরি।

যুদ্ধ করে বাঙালিরা
এনেছে প্রিয় স্বাধীনতা
তাদের মহান ত্যাগে
গড়া আমাদের সত্তা।

অষ্টম শ্রেণি, মুন্সিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, মুন্সিগঞ্জ

স্বাধীনতার গান

মনিরা চৌধুরী মেহজাবীন

স্বাধীনতার আলো জ্বলে
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে
শহিদেরা দিলো প্রাণ
রেখে গেল সোনার দান।

তাদের কথা মনে রাখি,
দেশকে ভালোবেসে থাকি।
স্বাধীন দেশের সোনার ফুল,
আমরাই হব দেশের মূল।

ছোট্ট আমি স্বপ্ন দেখি
দেশটা হবে সুখের পাখি
মিথ্যা কথা বলব না
দেশের ক্ষতি করব না।

সপ্তম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর

লাল-সবুজের দেশ

মো. জিয়াউল হক

আমার দেশে সকাল হলে
সূর্য ওঠে হাসি তুলে
২৬ মার্চ এল আবার
খুশি ভরা মন সবার।

শিশুরা সব পতাকা হাতে
দাঁড়ায় সবার সাথে সাথে
গান-কবিতায় মুখর দেশ
আনন্দের যেন নেই শেষ।

বীর শহিদদের মনে রাখি
শ্রদ্ধা ভরা ভালোবাসি
দেশের জন্য কাজ করব
সৎ মানুষ হয়ে থাকব।

স্বপ্নের স্বাধীনতা

তামান্না ইসলাম বৃষ্টি

২৫ মার্চের সেই
ভয়াল রাত
নিরীহ মানুষের
বুকে হয় আঘাত।

পাক বাহিনীর অত্যাচারে
কেঁদেছিল দেশ
বাংলার আকাশে ছিল
শোকের রেশ।

তবুও বাঙালি
হার মানেনি তখন
স্বাধীনতার স্বপ্নে
জেগে ওঠে মন।

নবম শ্রেণি, নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ





মুক্তিযুদ্ধের শিশুতোষ সিনেমা

তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানা চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়ে আসছে। এ দেশের সুস্থ ধারার চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রগুলো। এই চলচ্চিত্রগুলোর অনেকগুলোতে সরাসরি যুদ্ধের ভয়াবহতা উঠে এসেছে। এর মাঝে শিশু -কিশোর উপযোগী কিছু চলচ্চিত্রও নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের পেছনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগকে তুলে ধরা হয়েছে। ছোট্ট সোনামনিরা দেখে নিতে পারো এই সিনেমাগুলো।

আমরা তোমাদের ভুলব না (১৯৯৩)

মতলব নামের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের বর্ণনায় গড়ে উঠেছে গল্পটি। সরদার জয়েনউদ্দীনের উপন্যাস 'আমরা তোমাদের ভুলব না' অবলম্বনে হারুনুর রশীদের চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে এই সিনেমাটি।

ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ (২০০৯)

আনোয়ারা সৈয়দ হকের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে বাদল রহমানের সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত সিনেমা 'ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ'। ছোট্ট ছেলে ছানা। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা তাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে ছানার ঠিকানা হয় নানাবাড়িতে। সময়টা ছিল মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে। যুদ্ধ শুরু হলো। ছানা ও তার নানাবাড়ির সকলকে আত্মগোপনে চলে যেতে হয়। সিনেমাতে অভিনয় করেছেন আফসানা মিমি, প্রতীক, মুনমুন, দিনার, শিরিন বকুল, আমীরুল হক চৌধুরী প্রমুখ।



আমার বন্ধু রাশেদ (২০১১)

কিশোর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের তালিকায় রয়েছে মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত 'আমার বন্ধু রাশেদ' জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপন্যাস 'আমার বন্ধু রাশেদ' অবলম্বনে মোরশেদুল ইসলাম পরিচালনা করেছেন সিনেমাটি। ইবু তার ছোটোবেলার স্মৃতিচারণ করে ছেলের কাছে। একাত্তরে লাড্ডু নামের এক ছেলে ইবুর স্কুলে আসে ট্রান্সফার হয়ে এবং সেই থেকে তার নাম হয় রাশেদ। একসময় যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে বিতারিত হয় এবং ভোগান্তিতে পড়ে অনেক মানুষ। ইবু, রাশেদ, আশরাফরা সরাসরি যুদ্ধে যোগ না দিলেও তারা পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের। রাশেদ ও তার বন্ধুদের সাহসী তৎপরতায় তাদের এক কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। ইবুর বন্ধু রাশেদ সকলেরই বন্ধু হয়ে যায়। সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন চৌধুরী জাওয়াতা আফনান, রাইসুল ইসলাম আসাদ, পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, রায়ান ইবতেশাম চৌধুরী প্রমুখ।

যুদ্ধজয়ের কিশোর নায়ক (২০১৫)

লেখক শায়লা রহমান তিথির পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনুদানে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'যুদ্ধজয়ের কিশোর নায়ক'। চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা অবলম্বনে। যেখানে এক গ্রাম্য কিশোর নুরুর সাহস, কৌশল এবং আত্মবিশ্বাসকে দেখানো হয়েছে। নুরু সাহসিকতার সাথে অত্যন্ত কৌশলে পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকারদের কাছ থেকে অস্ত্র চুরি করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। তারপরই বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে অভিনয় করেছেন গোলাম ফরিদা ছন্দা, নূপুর হোসাইন, মুজাহিদ বিল্লাহ, ফারুকী, শাশ্বত স্বপন, আতিকুর রহমান শিহান, মোহনা হোসাইন প্রমুখ।

শোভনের স্বাধীনতা (২০১৫)

একাত্তরের বিভীষিকাময় সময়ে এক নির্ভীক কিশোরের আত্মত্যাগের আখ্যান নিয়ে গড়ে উঠেছে 'শোভনের স্বাধীনতা'। কিশোর শোভনের মনে দেশমাতৃকার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। গল্পের শুরু ২৫শে মার্চের কালরাত্রি থেকে। শোভনের বড়ো ভাই সুমন মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ভারত চলে যান। নিরাপত্তাহীনতার কারণে মা-বাবা শোভনকে গ্রামে ওর স্বাধীনতাবিরোধী মেজো মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। হানাদার বাহিনীর সাহায্যকারী ও অত্যাচারী মামার সাথে ঝগড়া করে গ্রাম ছেড়ে শোভন শামিল হতে চায় এ যুদ্ধে, তবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বয়স। এভাবেই চূড়ান্ত একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে চলচ্চিত্রটি। রশীদ হায়দারের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির সংলাপ, চিত্রনাট্য লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন মানিক মানবিক। সিনেমাতে অভিনয় করেছেন রুদ্র রাইয়ান, ফেরদৌস, নিপুণ, আতাউর রহমান, খায়রুল আলম সবুজ, চিত্রলেখা গুহ, ওয়াহিদা মল্লিক জলি প্রমুখ। ❑



আন্তর্জাতিক নারী দিবস

শাহানা আফরোজ

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এভাবে যতবার ইতিহাসের পট বদলেছে, উৎপাদন সম্পর্ক ততবারই পালটেছে। সব ক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। অর্ধেক জনশক্তি হিসেবে তাই নারীরা পূর্ণ অধিকারের দাবিদার । নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৪ সাল থেকে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে এ দিনটিকে স্বীকৃতি দেয়। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'অধিকার, ন্যায়বিচার, উদ্যোগ সব নারীর জন্য হোক'। এই দিনটিকে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত হয়েছে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন সংগ্রামী অধ্যায়ের সাথে। ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা বিপদজনক ও অমানবিক কর্মপরিবেশ, স্বল্প মজুরি এবং দৈনিক ১২ ঘণ্টা শ্রমের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। তাঁদের এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ হামলা চালায়। তিন বছর পরে ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চে নিউইয়র্ক শহরের গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নিজস্ব ইউনিয়ন গঠনে সমর্থ হন। এরপর ১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ আবারও নিউইয়র্ক শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়, যেটিতে বস্ত্রশিল্প কারখানার নারী শ্রমিকরা যোগ দেন। ৮ই মার্চ তারিখে এই ঘটনার ফলেই ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাব অনুসারে ঐ দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' ঘোষণা করা হয়।

প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

১৯০৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় নারী দিবস' পালিত হয়। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে 'সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট উইমেন্স কনফারেন্স'-এ ক্লারা জেটকিন প্রস্তাব দেন যে প্রতিবছর প্রতিটি দেশে একই দিনে দিবসটি পালন করা উচিত। এই দিবসে নারীরা নিজেদের দাবি জানাবেন। তাঁর প্রস্তাবে দিবসটি বিশ্বজুড়ে পালনের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ উল্লেখ করেননি। সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯১১ সালের ১৯শে মার্চ ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালিত হয়। পরে অবশ্য ৮ই মার্চ নির্ধারিত হয়। ১৯১৩ সালে রুশ সাম্রাজ্যে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে দিনটি ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রোববার (২৩শে ফেব্রুয়ারি)। আর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে তা ৮ই মার্চ। জার্মানিতে ১৯১৪ সালের ৮ই মার্চ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়।

সরকারি ছুটি ঘোষণা

- রুশ বিপ্লবে নারীদের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিপ্লবের মহানায়ক ভ্লাদিমির লেনিন ১৯২২ সালে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস ঘোষণা করেন। দিনটিতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন তিনি।
- একই বছর অর্থাৎ ১৯২২ সালে চীনে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। ১৯৪৯ সালে ৮ই মার্চ নারী দিবসকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে।

সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি দেওয়া সরকারি ছুটি ঘোষণা করার দেশের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

জাতিসংঘের স্বীকৃতি

- জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' ঘোষণা করে। একই বছর বিশ্ব সংস্থাটি প্রথমবারের মতো ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করে।
- দুই বছর পর ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক রূপ পায়।
- জাতিসংঘ প্রথমবার এই দিবসের একটা প্রতিপাদ্য ঠিক করে ১৯৯৬ সালে। জাতিসংঘ সে বছর 'অতীত উদ্‌যাপন, ভবিষ্যৎ ঘিরে পরিকল্পনা' প্রতিপাদ্যে দিবসটি পালন করে।

বছর	জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য
১৯৯৬	অতীত উদ্‌যাপন এবং ভবিষ্যৎ ঘিরে পরিকল্পনা
১৯৯৭	নারী এবং শান্তি
১৯৯৮	নারীর এবং মানবাধিকার
১৯৯৯	নারী প্রতি সহিংসতামুক্ত পৃথিবী
২০০০	শান্তি স্থাপনে একতাবদ্ধ নারী
২০০১	নারী ও শান্তি : সংঘাতের সময় নারীর অবস্থান
২০০২	আফগানিস্তানের নারীদের বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ
২০০৩	লিঙ্গ সমতা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
২০০৪	নারী এবং এইআইভি/ এইডস
২০০৫	লিঙ্গ সমতার মাধ্যমে নিরাপদ ভবিষ্যৎ
২০০৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী
২০০৭	নারী ও নারী শিশুর ওপর সহিংসতার দায়মুক্তির সমাপ্তি
২০০৮	নারী ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ
২০০৯	নারী ও কিশোরীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নারী-পুরুষের একতা
২০১০	সমান অধিকার, সমান সুযোগ- সকলের অগ্রগতি
২০১১	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ
২০১২	গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমাপ্তি

বছর	জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য
২০১৩	নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়
২০১৪	নারীর সমান অধিকার সকলের অগ্রগতির নিশ্চয়তা
২০১৫	নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবতার উন্নয়ন
২০১৬	অধিকার মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান
২০১৭	নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব কর্মে নতুন মাত্রা
২০১৮	সময় এখন উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম-জীবনধারা
২০১৯	সমতায় ভাবুন, স্মার্টলি গড়ুন, পরিবর্তনের জন্য উদ্ভাবন করুন
২০২০	প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারী অধিকার
২০২১	করোনাকালে নারী নেতৃত্ব গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব
২০২২	টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য।
২০২৩	ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন।
২০২৪	নারীদের ওপর বিনিয়োগ করেন; দ্রুত উন্নতি আনুন: অগ্রগতি ত্বরান্বিত করুন
২০২৫	সকল নারী ও মেয়েদের জন্য: অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন।
২০২৬	অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন



বজ্রপাতে থাকি সচেতন

রাশেদুল ইসলাম

বাংলাদেশে গত কয়েকদিনে বজ্রপাতে (Lightning) কমপক্ষে ৪০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিবছর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ৩০০ মানুষ প্রাণ হারান। মূলত মার্চ থেকে মে মাস, এই প্রাক-বর্ষার মৌসুমেই (Pre-monsoon Season) দেশে ৩৮ শতাংশ বজ্রঝড় ও তীব্র বজ্রপাত ঘটে থাকে। আর জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে (বর্ষাকাল) হয় ৫১ শতাংশ। বৈশাখ মাসে ঝড় রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলেই বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয়ভাবে একে কালবৈশাখি বলা হয়। কিন্তু পুস্তকের ভাষায় এটি বজ্রঝড়। অর্থাৎ মার্চ-মে মাসের ঝড়কে কালবৈশাখি ঝড় বলা হলেও জুন-সেপ্টেম্বরে ঝড় হলে তা, বজ্রসহ ঝড়।

বজ্রপাত কি

সাধারণভাবে আকাশের আলোর ঝলকানিকে বজ্রপাত বলি। এই সময় ঐ এলাকার বাতাসের প্রসারণ এবং সংকোচনের ফলে আমরা বিকট শব্দ শুনতে পাই। এ ধরনের বৈদ্যুতিক আধানের নির্গমন দুটি মেঘের মধ্যে অথবা একটি মেঘ এবং ভূমির মধ্যেও হতে পারে। বজ্রপাতে ডিসি কারেন্ট তৈরি হয়।

যে-কোনো বজ্রপাত তৈরি হতে তিনটি উপাদান প্রয়োজন। এগুলো হলো বাতাসের আর্দ্রতা, অস্থিতিশীল বায়ু আর ঊর্ধ্বমুখী বল। এরমধ্যে আর্দ্রতা সাধারণত আসে সাগর থেকে। সমুদ্রের আশপাশের এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এই আর্দ্রতাই আবার মেঘ তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রের

ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল স্যাটেলাইট, ডেটা এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের তথ্যমতে, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকা উষ্ণ আর আর্দ্র বাতাসের ওপরে শুষ্ক শীতল বাতাস থাকলে অস্থিতিশীল বায়ুর সৃষ্টি হয়। আর এই দুই স্তরের মধ্যে সৃষ্ট বায়ুর ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে ঊর্ধ্বমুখী বল তৈরি হয়, যা অস্থিতিশীল বায়ুকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়। আর একারণেই বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই বজ্রঝড়ের ভেতরে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু দ্রুত উপরে-নিচে চলাচল করে। ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহ বায়ুকে হিমাঙ্কের ওপরে ঠেলে দেয়, ফলে বায়ুর জলকণা বরফ বা শিলায় পরিণত হয়।

বজ্রমেঘের ভেতরে বরফ ও পানির মিশ্রণ একে অপরের সঙ্গে ঘর্ষণের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক চার্জ আদান-প্রদান করে। এতে ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক চার্জ জমা হয়, আর তা যথেষ্ট বড়ো হলে বজ্রপাত হয়ে নির্গত হয়। বজ্রপাতের সময় বায়ুর তাপমাত্রা প্রায় ৩০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে যা সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়েও বেশি। বাতাস এত দ্রুত উত্তপ্ত হওয়ার ফলে তা হঠাৎ প্রসারিত হয় এবং বায়ুর বিশাল কম্পন শকওয়েভ সৃষ্টি করে। এটিই বজ্রধ্বনি হিসেবে শোনা যায়।

বজ্রপাতের সময় কেন আগে আলো দেখা যায় এবং পরে শব্দ শোনা যায়। এর মূল কারণ হলো আলো এবং শব্দের বেগের পার্থক্য। আলোর বেগ শব্দের বেগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আমরা জানি আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩০০০০০ কিলোমিটার। অন্যদিকে ০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩৩২ মিটার। গতির এই পার্থক্যের কারণে বজ্রপাতের শব্দ বিদ্যুৎ চমকানোর একটু পরে শোনা যায়।

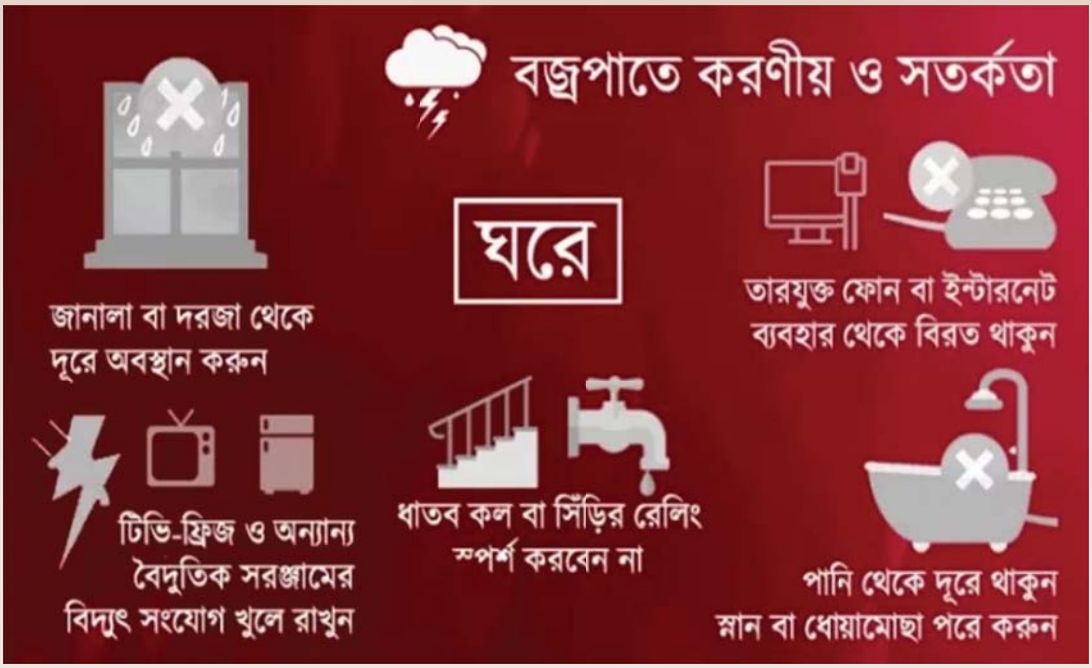
বজ্রধ্বনি শোনা গেলেও অনেক সময় বৃষ্টি দেখা যায় না। এ ধরনের পরিস্থিতিকে 'শুষ্ক বজ্রঝড়' বলা হয়। শুষ্ক বজ্রঝড়ের সময় মেঘের নিচের বায়ুস্তর খুব গরম বা শুষ্ক থাকার কারণে মেঘ থেকে নামা বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পৌঁছানোর আগেই বাষ্প হয়ে যায়।

এক জায়গায় বারবার বজ্রপাত

ইংরেজি পুরনো এক প্রবাদ হলো 'লাইটেনিং নেভার স্ট্রাইক্স দ্য সেইম প্লেস টোয়াইস', অর্থাৎ 'একই জায়গায় দুবার বজ্রপাত হয় না'। এই কথা দিয়ে মূলত কাউকে বোঝানো হয় যে যা কিছু খারাপ একবার হয়েছে, তা আর হবে না। বাগধারার কারণে অনেকেই মনে করেন কোনো একটি স্থানে একবার বজ্রপাত হলে, সেই একই জায়গায় দ্বিতীয়বার বজ্রপাত হয় না। তবে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে, এই কথার বাস্তবিক কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং আবহাওয়া আর পরিবেশগত দিক মিলিয়ে বজ্রপাত হবার জন্য সুবিধাজনক যে-কোনো জায়গায় বারবার বজ্রপাত হতে পারে।

বাংলাদেশে বেশি বজ্রপাত হয়

গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে বজ্রপাতের প্রবণতা বেশি হবার মূল কারণ হলো ভৌগোলিক অবস্থান। দেশটির একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, যার কিছু দূরেই হিমালয়। সেখান থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে। এই দুটো বাতাসের সংমিশ্রণ বজ্রপাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস (Moist Air) সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোতে ধাক্কা খেয়ে ওপরে উঠে ঠান্ডা হয়। অন্যদিকে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা উষ্ণ ও শুষ্ক বাতাসের সাথে এর সংঘাত ঘটে। এই দুই বিপরীতধর্মী বাতাসের মিলনে তৈরি হয় দানবীয় বজ্রমেঘ (Thundercloud/Cumulonimbus)। ২০১৬ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে বজ্রপাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।



বজ্রপাত বেশি হওয়ার কারণ

এবছর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের ওপরে আর্দ্রতার প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ায় মেঘের পরিমাণও বেড়ে গেছে। 'বজ্রমেঘ ও বজ্রঝড়ে'র সাথে এই আর্দ্রতার যোগসূত্র আছে'। তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার সাথে দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহ এক হয়ে বজ্রঝড়ের প্রাদুর্ভাব বাড়াচ্ছে বলে জানান গবেষকরা। শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণ জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, পাবনা ও রাজশাহী।

ব্যক্তির ওপর বজ্রপাত হলে করণীয়

কোনো ব্যক্তির উপরে বজ্রপাত হলে তার শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে যায়। তাই বজ্রপাতে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বজ্রপাতের কারণে মস্তিষ্কে আঘাতের পাশাপাশি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তবে আঘাত সামান্য হলে পেশিতে ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, বিভ্রান্তি, স্মৃতিশক্তির সমস্যা, মাথা ঘোরা এবং ভারসাম্যহীনতার মতো উপসর্গ দেখা যেতে পারে। খিটখিটে মেজাজ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, ঘুমের সমস্যা, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা, বিষণ্নতা এবং ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও আসতে পারে। বজ্রপাতে কেউ আহত হলে তাকে বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্তকারীর মতোই চিকিৎসা দিতে হবে।

ব্রজপাতে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎস্পন্দন দ্রুত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে পারলে বাঁচানো সম্ভব। তবে বেশি দেরি হলে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। সিপিআর দিয়ে হৃৎপিণ্ড সচল রাখতে হবে। এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স বা কোনো গাড়ি ডেকে দ্রুত আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেয়ার ক্ষেত্রে দেরি করা যাবে না। এছাড়া বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকে ধরার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। কারণ বজ্রপাতে আহত কিংবা মৃত ব্যক্তির শরীরে বিদ্যুৎ থাকে না।

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে করণীয়

- এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে।
- ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘর থেকে বের হব না; অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকা যাবে না।
- ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে যেতে হবে।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে।
- উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার, ধাতব খুঁটি এবং মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে।
- কালো মেঘ দেখা দিলে নদী-পুকুর-ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটানো যাবে না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
- বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকা যাবে না। জানালা বন্ধ রাখতে হবে এবং ঘরের ভেতরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে।
- মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে এবং এগুলো বন্ধ রাখতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এ সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজেদেরও বিরত থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাওয়া যাবে না, তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে।
- বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না।
- প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
- খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যেতে হবে।
- কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে চলে যেতে হবে। ❑

তথ্যসূত্র: দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সায়েন্স জার্নাল

প্রাবন্ধিক

আন্তর্জাতিক গণিত দিবস

মিনহাজুল ইসলাম

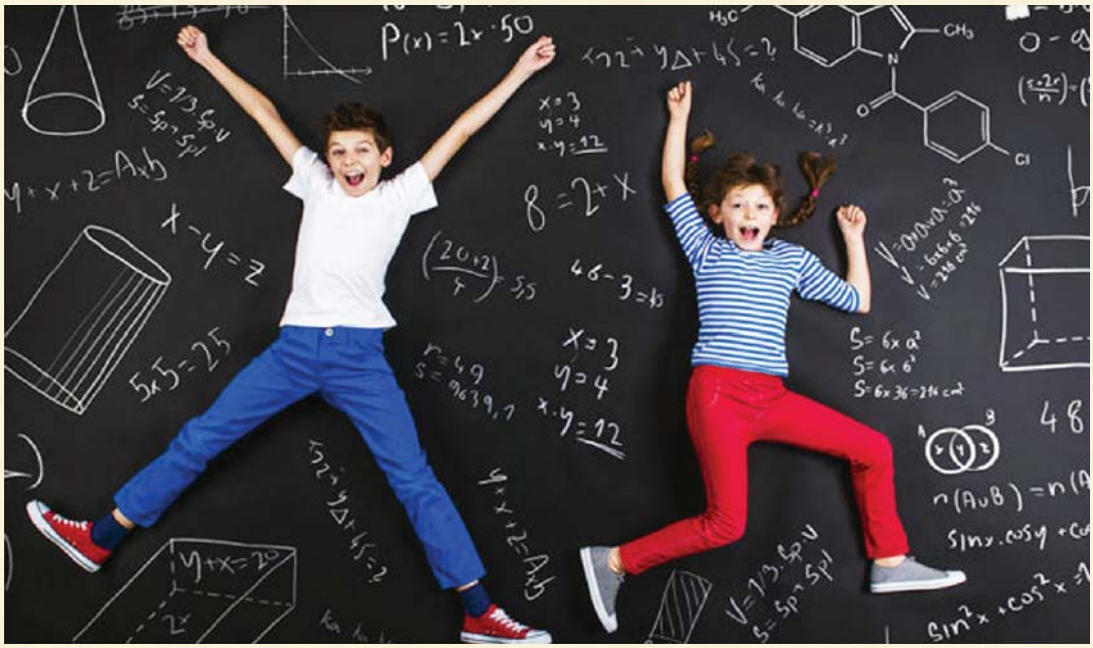
প্রতি বছর ১৪ই মার্চ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালিত হয়। গণিত আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা প্রতিদিন নানা কাজে গণিত ব্যবহার করি। বাজার করা, সময় হিসাব করা, টাকা গোনা, দূরত্ব মাপা–সব ক্ষেত্রেই গণিতের প্রয়োজন হয়। তাই গণিতকে বলা হয় বিজ্ঞানের ভাষা। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক গণিত দিবসকে অনেক সময় 'পাই দিবস'ও বলা হয়। কারণ গণিতে বহুল ব্যবহৃত একটি বিশেষ সংখ্যা হলো পাই (π), যার মান প্রায় ৩.১৪। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ১৪ই মার্চ লেখা হয় ৩/১৪, যা পাই সংখ্যার শুরুর সংখ্যার সঙ্গে মিলে যায়। এজন্য এই দিনটিকে গণিতের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

২০১৯ সালে UNESCO আন্তর্জাতিকভাবে ১৪ই মার্চকে আন্তর্জাতিক গণিত দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটি আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পালন করা হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। গণিত অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন ও দেয়ালিকা প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়।

গণিত শুধু একটি বিষয় নয়, এটি মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে। গণিত চর্চা করলে মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাড়ে। একজন শিক্ষার্থী যদি ছোটোবেলা থেকেই গণিত ভালোভাবে শেখে, তাহলে তার যুক্তিবোধ শক্তিশালী হয়। গণিত মানুষকে ধৈর্যশীল ও মনোযোগী হতেও সাহায্য করে।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে গণিতের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রকৌশল, কম্পিউটার- সব ক্ষেত্রেই গণিতের ব্যবহার রয়েছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, মহাকাশ গবেষণা কিংবা ব্যাংকের হিসাব- সবকিছুই গণিতের উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নত দেশগুলো গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।



বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক গণিত দিবস নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে গণিতভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়। বিশেষ করে গণিত অলিম্পিয়াড শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক জনপ্রিয়। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের ভয় দূর করে এবং গণিতকে আনন্দের বিষয় হিসেবে তুলে ধরে।

অনেক শিক্ষার্থী গণিতকে কঠিন মনে করে। কিন্তু নিয়মিত অনুশীলন করলে গণিত সহজ হয়ে যায়। শিক্ষক ও অভিভাবকদের উচিত শিশুদের গণিতের প্রতি উৎসাহ দেওয়া। ভয় না দেখিয়ে আনন্দের মাধ্যমে গণিত শেখালে শিশুরা সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারে। বাস্তব জীবনের উদাহরণ ব্যবহার করে গণিত শেখানো হলে শিক্ষার্থীরা বেশি আগ্রহ পায়।

গণিতের ইতিহাসও অনেক সমৃদ্ধ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গণনার জন্য গণিত ব্যবহার করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু বিখ্যাত গণিতবিদ জন্ম নিয়েছেন। তাদের আবিষ্কার ও গবেষণা মানবসভ্যতার উন্নতিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। আর্কিমিডিস, আইজ্যাক নিউটন এবং আলবার্ট আইনস্টাইন-এর মতো বিজ্ঞানীরা গণিতকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

আন্তর্জাতিক গণিত দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় গণিত শুধু পরীক্ষার বিষয় নয়, এটি জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। গণিত ছাড়া আধুনিক সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। তাই সবাইকে গণিত শেখার প্রতি আগ্রহী হতে হবে এবং গণিতভীতি দূর করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক গণিত দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে গণিতের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং নতুন প্রজন্মকে গণিত শিক্ষায় উৎসাহিত করা। গণিত আমাদের যুক্তিবাদী চিন্তা করতে শেখায় এবং জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। তাই আমাদের উচিত আনন্দের সঙ্গে গণিত শেখা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা। ❑

প্রাবন্ধিক

বিড়াল দ্বীপ

বর্তমানে পোষা প্রাণীদের মধ্যে মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে বিড়াল। বিড়াল প্রেমী বা ক্যাট লাভাররা বিড়ালদের তাদের কোমল স্বভাব, নিঃশব্দ চলাচল এবং আদুরে আচরণের জন্য ভালোবাসেন। এরা সাধারণত বিড়ালের সঙ্গ উপভোগ করেন, তাদের যত্ন নেন এবং অনেকেই বিড়ালকে ঘরের সদস্য মনে করেন। তবে ব্যতিক্রমী একটা খবর হলো জাপানিরা পুরো একটা দ্বীপ ছেড়ে দিয়েছে বিড়ালদের জন্য।

জাপানের সেতো ইনল্যান্ড সিতে ছোট্ট একটি দ্বীপ আছে যার নাম আওশিমা। এর আয়তন মাত্র ০.৫ বর্গকিলোমিটার। এখানে মানুষের চেয়ে বিড়ালের সংখ্যা বেশি। এই দ্বীপটিতে প্রায় ৮০টি বন্য বিড়াল আছে। মজার ব্যাপার হলো এই দ্বীপে মানুষের সংখ্যা মাত্র তিনজন, তারাও আবার বৃদ্ধ।

আওশিমা ছাড়াও জাপানে আরো ১১টি দ্বীপ রয়েছে যেগুলো 'বিড়াল দ্বীপ' হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে আওশিমা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বিজ্ঞান সাময়িকী লাইভ সায়েন্স-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে মানুষ এই দ্বীপ ছেড়ে দিতে পারে। কারণ, সেখানে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা খুব একটা নেই, মানুষও বাড়ছে না। তখন দ্বীপটি পুরোপুরি বিড়ালের দখলে চলে যেতে পারে। তবে সেখানে বিড়ালের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমছে।

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান থেকে জানা যায়, প্রায় ১০ বছর আগে এখানে ২০০টির মতো বিড়াল ছিল। কিন্তু ২০১৮ সালে ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালানো হয়। ফলে বিড়ালের সংখ্যা অর্ধেক কমে যায়। এরপর থেকে এই দ্বীপে আর কোনো বিড়ালের বাচ্চা জন্মানোর খবর পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এই দ্বীপের সব বিড়ালের বয়স সাত বছরের বেশি।





ক্যাট মামা নামে পরিচিত দ্বীপের বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সী নাওকো কামিমোতোর ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে তিনি বলেছিলেন, 'একসময় এমন দিন আসবে, যখন এখানে কোনো মানুষ থাকবে না, এমনকি কোনো বিড়ালও থাকবে না।

১৭ শতকে আওশিমা দ্বীপে বসতি গড়ে ওঠে। তখন এটি প্রায় ৯০০ জেলের গ্রামে পরিণত হয়। একসময় ঐ গ্রামে ঈদুরের প্রকোপ বেড়ে যায়। জেলেরা ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে কিছু বিড়াল নিয়ে আসে। কারণ, ওই সময়ে ইঁদুর মাছ ধরার জাল নষ্ট করত। কিন্তু ২০ শতকে মাছ ধরার ব্যাবসা কমে গেলে মানুষ দ্বীপ ছেড়ে মূল ভূখণ্ডে চলে যায়। কিন্তু অনেকেই তাদের বিড়াল রেখে যায় আর সেগুলোই বংশবৃদ্ধি করতে থাকে।

দ্বীপে থাকা এখনকার বিড়ালগুলো জাপানের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা খাবারের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। তারা দ্বীপের ছোটো ছোটো প্রাণীও খায়,

অনেক বিড়াল এখন পরিত্যক্ত বাড়ি ও ভেঙে পড়া ভবনে থাকে, যেগুলো ঝড় ও টাইফুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই দ্বীপের বাসিন্দা কামিমোতো প্রতিদিন দুবার তাদের খাওয়ান এবং অসুস্থ বিড়ালদের ওষুধ দেন।

আওশিমার বেশির ভাগ বিড়াল কমলা রঙের। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের জিনে জাপানের অন্য দ্বীপের বিড়ালের চেয়ে কিছুটা পার্থক্য আছে। কামিমোতো বলেন, 'অনেকে ছবি দেখে মনে করেন বিড়ালগুলো অবহেলিত। কিন্তু আসলে তা নয়।

মানুষ যদি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে স্থানীয়রা মনে করেন, স্বেচ্ছাসেবক ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বিড়ালগুলোকে নিয়ে যাবে। তবে আপাতত এই বিড়ালগুলো পর্যটকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। দর্শনার্থীরা নৌকায় করে এখানে আসেন এবং বিড়ালদের খাবার দেন।

সূত্র: ইন্টারনেট

প্রতিবেদন: সুমন রেজা

পানি হোক নিরাপদ



প্রতি বছর ২২শে মার্চ সারা বিশ্বে 'বিশ্ব পানি দিবস' (World Water Day) পালিত হয়। এবারের বিশ্ব পানি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো 'পানি ও লিঙ্গ সমতা' (Water and Gender)। এই বছরের ক্যাম্পেইন স্লোগান হলো 'পানির প্রবাহ যেখানে, সাম্যের হাসি সেখানে' (Where Water Flows, Equality Grows)। এই স্লোগানের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সুবিধা সবার জন্য বিশেষ করে নারীর জন্য সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পানি দিবসের থিমটি নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘের সমন্বয় সংস্থা UN-Water এবং এবারের ক্যাম্পেইনের সহ-নেতৃত্ব দিচ্ছে UNICEF ও UN Women।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বাতাসের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পানি। কিন্তু পৃথিবীতে ব্যবহারযোগ্য সুপেয় পানির পরিমাণ খুবই সীমিত। তাই পানির সঠিক ব্যবহার এবং অপচয় রোধ করা এখন সময়ের দাবি।

পৃথিবীর তিন ভাগ পানি হলেও মানুষের পান করার যোগ্য পানি মাত্র ১ শতাংশের মতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই পানির উৎসগুলো দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে বা দূষিত হচ্ছে। আমরা যদি এখনই সচেতন না হই, তবে অদূর ভবিষ্যতে পানির অভাবে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

তোমরা যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তোমাদের ছোটো ছোটো কিছু পদক্ষেপ বদলে দিতে পারে অনেক কিছু। যেমন-

- **ব্রাশ করার সময় সতর্কতা:** ব্রাশ করো বা সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সময় কল খুলে না রেখে কাজ শেষে প্রয়োজনমতো পানি ব্যবহার করো। এতে প্রতিদিন কয়েক লিটার পানি সাশ্রয় হয়।
- **কল মেরামত:** বাসায় বা স্কুলে কোনো কল দিয়ে যদি ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে, তবে বড়োদের জানিয়ে দ্রুত তা মেরামতের ব্যবস্থা করতে পারো।
- **গোসলের সময় সাশ্রয়:** ঝরনা ছেড়ে অনেকক্ষণ গোসল না করে বালতিতে মেপে পানি ব্যবহার করার চেষ্টা করো।
- **গাছে পানি দেওয়া:** সকালে বা বিকেলে গাছে পানি দিলে তা দ্রুত বাষ্পীভূত হয় না, ফলে কম পানিতেই গাছের যত্ন নেওয়া যায়।
- **বড়োদের সচেতন করা:** অনেক সময় বড়োরা অজান্তেই পানি অপচয় করেন। গাড়ি ধোয়া বা ঘর পরিষ্কারের সময় যাতে হোস পাইপ ব্যবহার না করে বালতি ব্যবহার করা হয়, সে ব্যাপারে তাদের অনুরোধ করতে পারো।

পানি শুধু আমাদের তৃষ্ণা মেটায় না, এটি পুরো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। নদীনালা ও জলাশয়ে প্লাস্টিক বা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। পানির উৎসগুলো পরিষ্কার রাখা মানেই হলো জীববৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখা।

'পানির অপর নাম জীবন' –এই কথাটি কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে হবে। মনে রেখো, আজ তুমি যে এক গ্লাস পানি সাশ্রয় করলে, তা পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য একটি বড়ো অবদান। তাই চলো, এই বিশ্ব পানি দিবসে শপথ করি– আমরা পানি অপচয় করব না এবং অন্যকেও সচেতন করব।

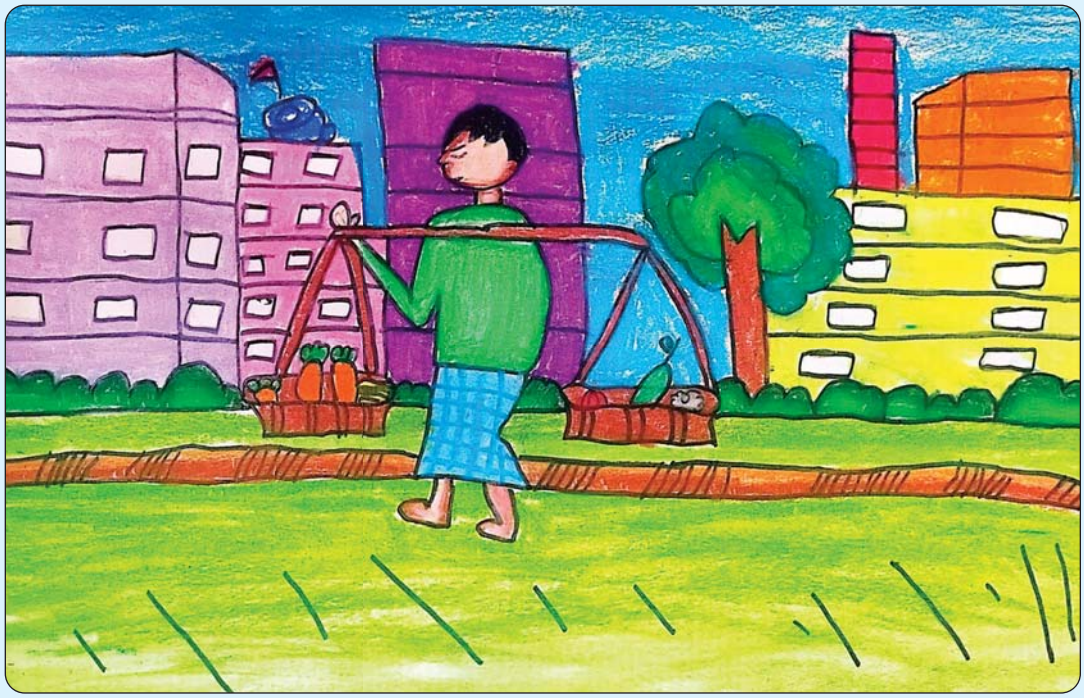
প্রতিবেদন: তারান্নুম সাদিকা



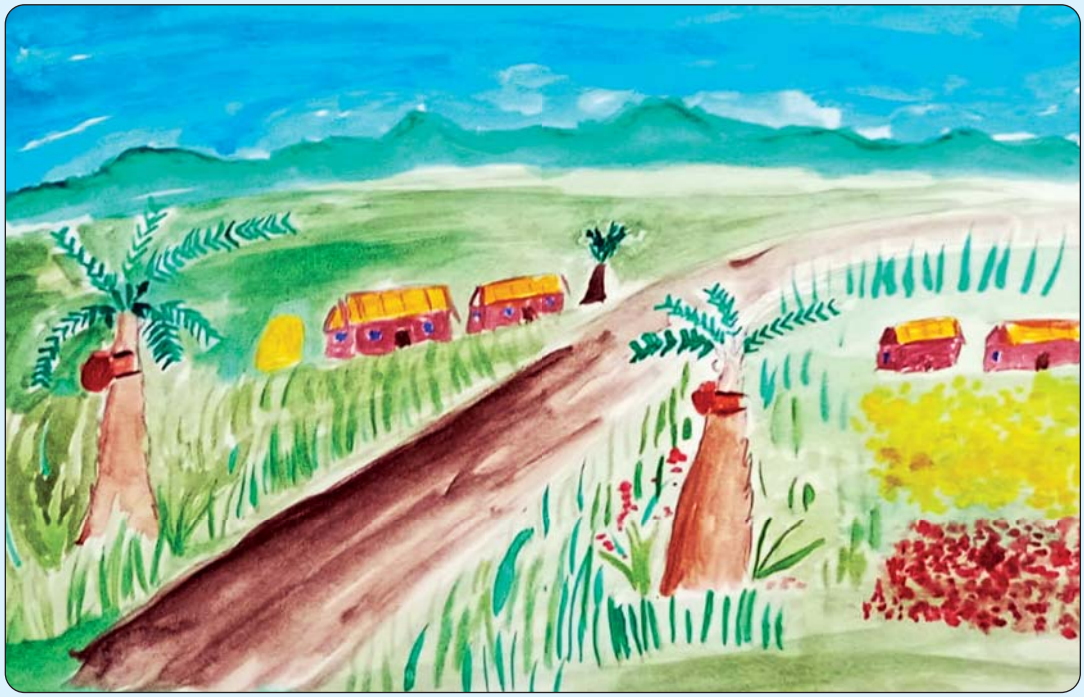
জায়েদ বিন রাব্বি, পঞ্চম শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



সামিহা হোসেন উম্মি, পঞ্চম শ্রেণি, ব্রাঞ্চমার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, টঙ্গী, গাজীপুর

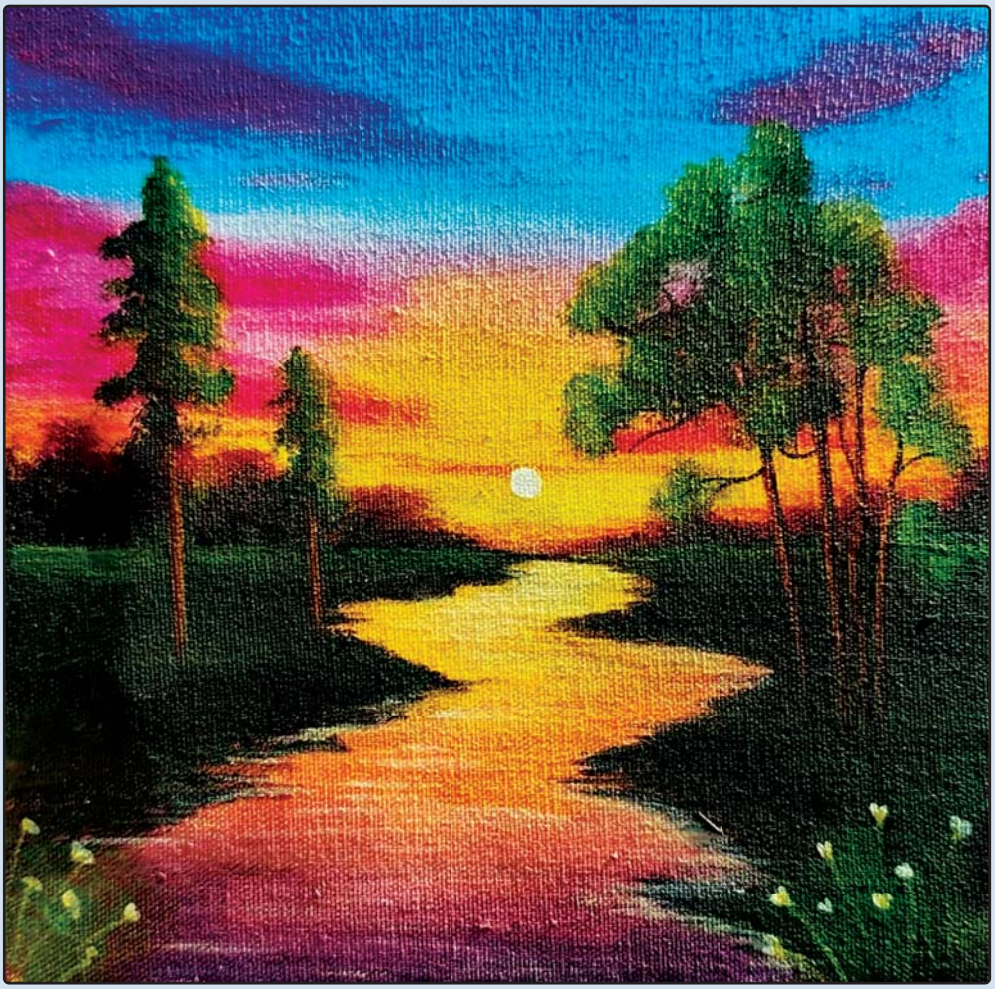


হুরাইন হক কাশফিয়া, তৃতীয় শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ



সাইফান মাসুদ আলী, ষষ্ঠ শ্রেণি, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-9. March 2026, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



তাসফিয়া নাজনীন সিনথিয়া, সপ্তম শ্রেণি, তামিরুল মিল্লাত মহিলা কামিল মাদরাসা, যাত্রাবাড়ি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা